বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

পত্র—ডিএসই/DSE-৪০৪
বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Prof. (Dr.) Tapati Chakrabarty,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. তুষার পটুয়া — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৪

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self-Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from **Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of the PG-BoS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self-Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self-Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

বাংলা
চতুর্থ সেমেস্টার

পাঠক্রম
পত্র—ডিএসই/DSE-৪০৪
বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ ১ : রবীন্দ্র দর্শন (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক ১. দর্শন সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

একক ২. রবীন্দ্র দর্শনের পটভূমি

একক ৩. বেদান্ত দর্শন

একক ৪. উপনিষদ ও রবীন্দ্রমানস

পর্যায় গ্রন্থ ২ : রবীন্দ্র দর্শন (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক ৫. ব্রহ্মবিদ্যা—আনন্দব্রহ্ম ও রবীন্দ্রবোধ

একক ৬. উপনিষদের অহং ও আত্মা সম্পর্কিত রবীন্দ্রচেতনা

একক ৭. উপনিষদের ঈশাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রবীক্ষা

একক ৮. উপনিষদের ঐক্যবোধ-বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয় : রবীন্দ্রনাথ

পর্যায় গ্রন্থ ৩ : য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক ৯. প্রথম পত্র, দ্বিতীয় পত্র, তৃতীয় পত্র

একক ১০. চতুর্থ পত্র, পঞ্চম পত্র, ষষ্ঠ পত্র

একক ১১. সপ্তম পত্র, অষ্টম পত্র, নবম পত্র

একক ১২. দশম পত্র, একাদশ পত্র, দ্বাদশ পত্র, ত্রয়োদশ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ ৪ : রাশিয়ার চিঠি (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক ১৩. রাশিয়ার চিঠি

একক ১৪. রাশিয়ার চিঠি

একক ১৫. রাশিয়ার চিঠি

একক ১৬. রাশিয়ার চিঠি

পত্র—ডিএসই/DSE-৪০৪
বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

সূচিপত্র

পত্র—ডিএসই/ DSE-৪০৪	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১ (রবীন্দ্র দর্শন)	১.	দর্শন সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা	অধ্যাপক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	১-৪
	২.	রবীন্দ্র দর্শনের পটভূমি	অধ্যাপক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	৫-৮
	৩.	বেদান্ত দর্শন	অধ্যাপক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	৯-১২
	৪.	উপনিষদ ও রবীন্দ্রমানস	অধ্যাপক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	১৩-১৭
পর্যায় গ্রন্থ ২ (রবীন্দ্র দর্শন)	৫.	ব্রহ্মবিদ্যা—আনন্দব্রহ্ম ও রবীন্দ্রবোধ	অধ্যাপক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	১৮-২৪
	৬.	উপনিষদের অহং ও আত্মা সম্পর্কিত রবীন্দ্রচেতনা	অধ্যাপক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	২৫-২৭
	৭.	উপনিষদের ঈশাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রবীক্ষা	অধ্যাপক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	২৮-৩৩
	৮.	উপনিষদের ঐক্যবোধ-বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয় : রবীন্দ্রনাথ	অধ্যাপক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	৩৪-৪১
পর্যায় গ্রন্থ ৩ (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র)	৯.	প্রথম পত্র, দ্বিতীয় পত্র, তৃতীয় পত্র	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	৪২-৪৬
	১০.	চতুর্থ পত্র, পঞ্চম পত্র, ষষ্ঠ পত্র	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	৪৭-৪৯
	১১.	সপ্তম পত্র, অষ্টম পত্র, নবম পত্র	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	৫০-৫৪
	১২.	দশম পত্র, একাদশ পত্র, দ্বাদশ পত্র, ত্রয়োদশ পত্র	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	৫৫-৫৯
পর্যায় গ্রন্থ ৪ (রাশিয়ার চিঠি)	১৩.	রাশিয়ার চিঠি	ড. তুষার পটুয়া	৬০-৬৫
	১৪.	রাশিয়ার চিঠি	ড. তুষার পটুয়া	৬৬-৭০
	১৫.	রাশিয়ার চিঠি	ড. তুষার পটুয়া	৭১-৭৩
	১৬.	রাশিয়ার চিঠি	ড. তুষার পটুয়া	৭৪-৭৬

ডিএসই-৪০৪

বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ১

দর্শন সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.১.১.১ : দর্শন সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

৪০৪.১.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৪.১.১.১ : দর্শন সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

দৃশ্ ধাতু-নিষ্পন্ন 'দর্শন' পদটির সাধারণ অর্থ দৃষ্টি অথবা দৃষ্টির ক্রিয়ারূপ দেখা। ইন্দ্রিয়ের দর্শন বা ইন্দ্রিয় সহযোগে কোনো বস্তুর বাহ্য রূপের পরিচয় গ্রহণকে বলে দর্শন। সে দিক থেকে আমরা সকলেই যা দেখি তাই আমাদের দর্শন। আর যিনি দর্শন করেন তিনিই দার্শনিক।

কিন্তু দেখার আশ্রয় তো কেবল বহিরিন্দ্রিয় নয়। আবার তার বিষযও কেবল বস্তুনির্ভর নয়। প্রথমত আমরা কেবল চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি এমন তো নয়। তাহলে বাইরের ইন্দ্রিয় অতিক্রমী 'মন' নামক পদার্থটির ক্রিয়া বাতিল করে দিতে হয়। অথচ মনোবিজ্ঞানের বিচরণের প্রসারিত ক্ষেত্রটি পল্লবিত হয়েছে তথাকথিকত অযৌক্তিত্ব-অবাস্তব নির্জ্ঞান মনের জটিল রহস্যময় বিচিত্র জগতকে আবেষ্টন করে। মন দেহভাণ্ডের কোথায় আছে আমাদের জানা নেই। এক্ষেত্রে তার্কিক যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী মস্তিকের অন্যতর ক্রিয়াকেই মন বলে চিহ্নিত করবেন। মনের অবস্থান নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে না পড়েও বেশ বুঝতে পারি মন থেকেই মনন এবং আমরা মানব-প্রজাতি মনন করি বলেই মননশীল। মননশীলতা মানুষের ধর্ম।

বাহ্যবস্তুগুলির দর্শনে আমাদের বহিরিন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে ওঠে সত্য। কিন্তু পৃথিবীতে বস্তু কি কেবল বাইরের অন্তরের নয়? বাহ্য বস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ যে নিকট তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু ভাববস্তুও তো বস্তু বাহ্যবস্তুর সংখ্যা যেমন পার্থিব বস্তুগুলি বিনাশশীল, অন্যদিকে ভাবের বস্তুগুলি আত্মিক তথা কাল্পনিক বলে তা অবিনাশী। অর্থাৎ কোনো দিন তারা মরে না, জীর্ণ হয় না। এই ভাববস্তুগুলি মনোময় দৃষ্টিতেই সত্য হয়ে ওঠে।

বাহ্যবস্তু ও ভাববস্তু—এ দুই-ই স্রষ্টার মৌলিক কল্পনা, হৃদয়ের রঙ ও হৃদয়ের স্পর্সে রসবস্তুতে পরিণত হয়। এই রসবস্তুই সাহিত্যের বিষয়। রসবস্তুর বিচিত্র রহস্য ধরা পড়ে নান্দনিক বোধে। এই বোধ থেকে আনন্দ, বোধ থেকেই রসোপলব্ধি। সাহিত্যে, প্রজ্ঞানে, বিজ্ঞানে সর্বত্র সেই আনন্দরসের জোয়ার। সকলযুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ পরিণামী সিদ্ধান্তে একপ্রকার পরম আনন্দময় প্রাপ্তির অন্বেষায় সফলতা খোঁজে। একটা গভীর অনুভূতি

একটা অন্তরিন্দ্রিয় সজাগ-সচল হয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমানা বাড়িয়ে দেয়। দেখা-শোনা-চেনা-জানার বিশাল অন্তহীন জগৎকে মানুষ প্রসারিত করে চলেছে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। এর পেছনে প্রবল শক্তিরূপে কাজ করে চলেছে বীক্ষণের অন্তর্ভেদীরূপ। এই শক্তিকেই মনীষী কার্লাইল বলেছিলেন, প্রতিভার দৃষ্টি—'It is this that discloses the inner hermony of things'। দার্শনিকের বস্তুদর্শনও তাই প্রতিভার দর্শন। যাঁর এরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আছে, তিনিই দার্শনিক।

প্রাচ্যভূমি ভারতবর্ষে 'দর্শন' পদটি বহু অর্থদ্যোতক হলেও পারমার্থিক জ্ঞান-বোধও তার প্রকাশ অর্থে তার ব্যবহার সুপ্রচলিত। মানবজীবনের আপাত লক্ষ্য ধর্ম-অর্থ-কাম হলেও তার পরিণামী লক্ষ্য মুক্তি বা নির্বাণ। সুতরাং, চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিতেই জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু এ বোধ সাধারণ গৃহীর। যিনি পারমার্থিক, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অথবা যিনি গৃহী হয়েও মনোধর্মে ত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁর জীবনের লক্ষ্য যিনি পরমবস্তু, পরমসম্পদ সেই রসস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদ বা ঈশ্বপরপদ প্রাপ্তি। এতেই পরম সুখ, পরম সফলতা। সেই সফলতার সন্ধানী মৈত্রেয়ী তাই অবহেলাভরে বিনাশশীল পার্থিব সম্পদ—ভোগ-সুখের সহস্র উপকরণকে তুচ্ছ করতে পারেন, বলতে পারেন 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম।' —যা দিয়ে আমি আনন্দস্বরূপ, অমৃতময় ব্রহ্মকে পাবো না, তা দিয়ে কী করবো? তাই কেবল পারমার্থিক বা ধর্মীয় উপলব্ধিই নয়। সেই বোধের মাধ্যমে নরনারীকে জীবনের পরম লক্ষ্য বা পরমপ্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলাও দর্শনের বিষয়। এই অর্থে যিনি দার্শনিক তিনি পারমার্থিক, শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী। এমন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই কালিদাস 'অতীন্দ্রয়েষপ্যুপন্নদর্শনঃ' (রঘুবংশ—৩.৪.১) নামে চিহ্নিত করেছেন। এই শক্তিতে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় সহযোগে ইদং সর্বং বিদিতম্'—সকল তত্ত্বই জানা হয়ে যায়—এমন কথা বলেছেন বৈদিক শতপথব্রাহ্মণ'। এই সূত্রে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনশাস্ত্র—ন্যায় বৈশষিক, সাংখ্য যোগ, পূর্ব মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ষড়দর্শনের প্রবক্তাদের দার্শনিক বলে উল্লেখ করা হয়। যে-কোনো প্রকার গভীর অনুভূতি তা সে ভৌমই হোক বা পারমার্থিক, তাঁকে যিনি উপলব্ধির নিবিড়তায় মানবসমাজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন তিনি দার্শনিক। আমাদের দেশে আচার্য কণাদ থেকে পতঞ্জলি-জৈমিনির মধ্য দিয়ে গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর, আচার্যশঙ্কর প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবক্তাগণ তাই দার্শনিক এবং তাঁদের উপলব্ধ ও প্রচারিত ধর্মবোধ যথাক্রমে হিন্দুদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, জৈন দর্শন প্রভৃতি নামে চিহ্নিত। অন্যান্য ধর্মদর্শনের তুলনায় বৌদ্ধদর্শন অনেক বেশি কার্যকর (Practical) ভূমিকা গ্রহণ করলেও ভারতীয় দর্শন মূলতঃ ভাববাদী দর্শন (Idealistic Philosphy)। তবে তার পাশাপাশি বস্তুবাদী তথা জড়বাদী দর্শনের (Objective or Materialistic Philosophy) চর্চাও যে ছিলো প্রাচীন ভারত-উপমহাদেশে সে কথা বলাই বাহুল্য। বস্তুত বিশ্বের প্রাচীতম ধর্ম-দর্শনের পীঠস্থান এই ভারতভূমি। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্বের প্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায়গুলি তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে বলবৎ করবার জন্যই 'ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক পটভূমি আশ্রয় করেছিলেন। ধর্মবোধ ও দর্শন তাই প্রাচীনের দৃষ্টিতে অভেদ ও একাত্ম।

অন্যদিকে সুপ্রাচীন ইউরোপে ভাববাদী দর্শনের চর্চা হলেও মধ্য ও আধুনিক ইউরোপে Philosophy) শব্দটি মূলতঃ যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বীক্ষণকে বুঝিয়েছে। যা অবাস্তব, কাল্পনিক এবং যুক্তি ও বুদ্ধির বাইরে তেমন কোনো কিছুকে তাঁরা দর্শন বলতে নারাজ। তাই তাঁদের উপলব্ধির প্রেক্ষণবিন্দুতে Intitution বা বোধিরূপ প্রজ্ঞার স্থান গৌণ, মুখ্য স্থান অধিকার বসেছে Rationality আশ্রিত যুক্তি-তর্ক। বিচার-বিশ্লেষণ দার্শনিক দেকার্তের (Rene Descarties) সেই বিখ্যাত উক্তি—'Cogito Ergo Sum', অর্থাৎ আমি আছি, আমি চিন্তা করি। সুতরাং, আমি কথাবলি, ইংরেজি করে বললে অর্থ দাঁড়ায়, 'I am I think, therefore, "I express'—বাক্যটিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার ভিত্তিভূমি হল এই রূপ যুক্তিবাদ

(Rationality) ও মেধাশ্রিত বাস্তব পর্যবেক্ষণ (Realistic Observaiton)। আমাদের চারপাশের বস্তুজগতাশ্রিত কতকগুলি মৌলিক ধারণাকে চুল চেরা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে এই যুক্তিবাদনির্ভর দর্শন। বলা বাহুল্য, এই দর্শনের কাছে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ, প্রজ্ঞাদর্শন, কল্পনানির্ভর অলৌকিক বিশ্বাস মুখ থুবড়ে পড়েছে। আত্মার অবিনশ্বরত্ব (Immortality of the Soul) প্রভৃতি অবাস্তব বিষয় নিয়ে তাঁদের মাথা ব্যথা নেই কেননা যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, যা প্রত্যক্ষ নয় কল্পনা-ভাবাবেগ বা নিছক অনুমাননির্ভর—তেমন কোনো কিছুর প্রতিই তাঁদের আস্থার অভাব। প্রামাণ্য বিষয় (Thesis), বিরুদ্ধ প্রমাণ (Antethesis) ও তাকে নস্যাৎ করে পরিণাম সিদ্ধান্ত (Synthesis) বৈজ্ঞানিক আলোচনার মূল তিনটি উপাদানের ভিত্তিভূমিও হল ওই Realistic of Materialistic Philosophy, সমগ্র বিশ্বে এখন এই জড়বাদী দর্শনেরই প্রাধান্য।

যাইহোক, পাশ্চাত্য দর্শনে মানবসমাজে প্রতিফলিত বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা, যুক্তি-বুদ্ধিদীপ্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মননের আলোয় তাদের গ্রহণ সংস্কার, সম্প্রসার ও সম্প্রচার প্রভৃতি সবকিছুই দার্শনিক বিশ্লেষণের অঙ্গীভূত। যে-কোনো প্রকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও এই দার্শনিক অবেক্ষণের বিষয়গুলি অনুঘটকের (Co-eddicient) কাজ করে। সেইজন্যই Philosophy কথাটিকে যথেষ্ট মর্যাদা ও মূল্যমানে বিভূষিত করে বলা হয়েছে, 'Where Science ends Philosophy begins'। বিজ্ঞানের অন্বেষা যেখানে থেমে যায়, দর্শনের সূচনা সেই মাত্রা থেকে। অনেক প্রাচীন-মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সভ্যতা বিকাশের মননঋদ্ধ ব্যাখ্যায় দর্শনের অবদান বিশ্বস্বীকৃত— 'Philosophical inquiry is a Central element in the intellectual history of many civilisation'। (Britanica : Ready reference Encyclopedia, P-269) স্থান-কাল-পাত্র ও বিষয় ভেদে মননশীলতার রূপও হয় ভিন্নমুখী। তবে দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের জন্য নানা মুনির নানা মত থাকলেও বস্তুসত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বিচারবোধের শৃঙ্খলা ও পারম্পর্যকে অল্পবিস্তর মান্যতা (Standard) দান করা হয়েই থাকে। যেহেতু দর্শন (Philosophy) শব্দটি বিভিন্ন ধর্মসমপ্রদায়ের ধর্মীয় বোধ ও তার বিশ্লেষণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে ধরা পড়েছে সেইজন্য অনেক ইউরোপীয় দার্শনিক-বিজ্ঞানী মনে করেন ধর্ম মানেই দর্শন অথবা দর্শন মানেই ধর্ম। টমাস অ্যাকুইনাস, জর্জ বার্কলি, সোরেন কিয়ের্কেগার্ড প্রমুখ দার্শনিক মনে করতেন, "Philosophy as a means of defending religion and dispelling the antireligious errors of Materialism and Rationalism" দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গণিতবিদ্যায় (Mathematics) পারদর্শী। তাই তাঁদের বস্তুসত্যাশ্রিত বোধ ও জ্ঞানপরিধির সঙ্গে গাণিতিক পদ্ধতিক্রম অনুযায়ী বিন্যাস যুক্ত হয়ে পড়তো। টমাস হবস্, জাঁ জ্যাকিউস রুশো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাজনৈতিক দর্শনের (Political Philosophy) প্রবক্তা এবং পূর্বকথিত গাণিতিক আদর্শের অনুগামী। অন্যদিকে গ্রিক দার্শনিক সক্রেতিস, প্লেটো প্রভৃতি ছিলেন ন্যায় নীতিবোধে (Ethics) বিশ্বাসী। আবার ফ্রান্সিস বেকন, আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দ ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানের (Physics) আলোকে বস্তু ও পদার্থের গঠন এবং সেই আলোকে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সকল বিদ্যার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে যুক্ত হয়েছে দর্শন ও দার্শনিকতার নানান মাত্রা—সৌন্দর্য-দর্শন (Aesthetics), জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) আশ্রিত দর্শন, তর্কবিদ্যা ও ন্যায় দর্শন (Logic & Ethics) অধিবিদ্যা বা অতীন্দ্রিয় দর্শন (Metaphysics), মনোবিজ্ঞান (Psychology of Philosophy of Mind) নৃতাত্ত্বিক দর্শন (Philosophical anthropology), আন্তমহাদেশীয় দর্শন (Continental Philosophy), নারীবাদী দর্শন (Feminist Philosophy), বিজ্ঞান দর্শন (Philosophy of Science) প্রভৃতি দর্শনের নানা শাখা-প্রশাখা।

ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের বহুমুখী ধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আকৈশোর বেদান্ত দর্শন তথা উপনিষদ দর্শনের অনুরাগী রবীন্দ্রচিত্তে দেশজ ও বিদেশী দর্শনের আবহ কীভাবে ওতোপ্রোত হয়ে তাঁর নিজস্ব মননশীল দার্শনিকতার পটভূমি রচনা করেছিল তা আমাদের ধারাবাহিক আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৪০৪.১.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ঔপনিষদিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে আলোচনা করে তার সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের স্বাতন্ত্র্য কোথায় দেখাও।

২। রবীন্দ্রসৃষ্টি তথা দর্শনে মানবপ্রেমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ডিএসই-৪০৪
বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ২
রবীন্দ্র দর্শনের পটভূমি

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.১.২.১ : রবীন্দ্র দর্শনের পটভূমি

৪০৪.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৪.১.২.১ : রবীন্দ্র দর্শনের পটভূমি

'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান—গূঢ় ও পবিত্র অধ্যাত্মজ্ঞান। আর্য ভারতের সনাতন জ্ঞান ও মনীষার অফুরন্ত আকর 'বেদ'। 'বেদ' গুহ্যবাদ ও দার্শনিক মতে পূর্ণ। ঋক-সাম-যজুঃ অর্থবাদি বেদ চতুষ্টয়ের মন্ত্র—ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ এই চার ভাগ। উপনিষদ্ ভাগ—বৈদিক দর্শন। উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যার আকর।

'উপনিষদ্' শব্দের নানা অর্থ। আভিধানিক অর্থে উপনিষদ—সদগুরু-সমাহৃত গূঢ়-গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান। বিশেষ অভিনিবেশ আছে এমন শিষ্যই এই জ্ঞানলাভের অধিকারী। সাধারণ অর্থে উপনিষদ—গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান সংক্রান্ত দার্শনিক গ্রন্থ। যুগ যুগ ধরে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানবিক চিন্তার এক বিশেষ রূপ উপনিষদে পরিস্ফুট। যুক্তিবলে অথবা ধ্যানবলে ভারতীয় অধিগণ তাঁদের উপলব্ধ দার্শনিক সত্যকে চিরকালের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে গেছেন।

অনেকগুলি উপনিষদের মধ্যে ঈশ-কেন-কঠ প্রভৃতি মাত্র দশখানিকে প্রামাণ্য ধরা হয়। আচার্য শংকর ওই দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং প্রামাণিক দশখানি উপনিষদকেই আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

যাইহোক, উপনিষদের দার্শনিক উৎকর্ষ বিশ্ববন্দিত। পারসিক ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ পাঠ করে জার্মান দার্শনিক সোপেন হাওয়ার বলেছিলেন, "সমগ্র জগতে যত বিদ্যা আছে, তাদের মধ্যে 'ঔপেনেখেদের' (উপনিষদের পারসিক অনুবাদ) ন্যায় উপকারী ও মনের উন্নতি বিধায়ক কোনো বিদ্যা নেই। ইহা আমার জীবনে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুতেও সান্ত্বনা দিবে।' দার্শনিক মণীষী ম্যাক্সমুলারও উপনিষদের উচ্চ অধ্যাত্ম-আদর্শের গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন।

দেশীয় গুণীজনদের মধ্যে এ যুগের রবীন্দ্রনাথ বাদেও স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দের মতো মণীষী 'বেদান্ত'কে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন।

উপনিষদের প্রধান আলোচ্য আত্মজ্ঞানের কথা। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন হতে হয়। পরমাত্মা রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতী।' তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী—দ্বিতীয় বল্লী)।

সম্পূর্ণ বেদের ত্রিবিধ কাণ্ড—কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। প্রকৃত প্রস্তাবে উপাসনাকাণ্ডও কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড উভয়ের সম্মিলিতরূপের ভাষ্য—'পূর্ব-মীমাংসা'। আচার্য জৈমিনি এর ভাষ্যকার। উপনিষদ্ বা বেদান্ত জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়। ইহাই 'উত্তর-মীমাংসা' বা বেদান্ত-দর্শন। মহর্ষি ব্যাস 'ব্রহ্মসূত্র' রচয়িতা। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বৈষম্য মীমাংসা-কল্পে ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা। ইহা উপনিষদমূল।

আচার্য জৈমিনির 'পূর্ব-মীমাংসা' মতে জীব নিত্য বেদোক্ত কর্মে রত। কর্মই জীবনে ভোগের এবং মুক্তির উপায়। কর্মই ব্রহ্ম কর্মই ফলদাতা। কর্ম-মীমাংসকের মতে কর্ম ছাড়া ঈশ্বরের দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই। কর্মকাণ্ডের স্বর্গ-ফল রবীন্দ্র-স্বীকৃতি পেতে পারে না। জ্ঞানকাণ্ড ও উপনিষদ নিয়ে তাঁর কারবার।

ব্রহ্ম-মীমাংসক ব্যাসদেব জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, কর্ম জ্ঞাননিষ্ঠার সহকারী মাত্র। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মানই-কর্মের তাৎপর্য। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। অর্থাৎ কর্মমার্গের পরোক্ষ লক্ষ্যও মোক্ষ। কর্ম মুক্তির একটা প্রাথমিক সোপান মাত্র। কর্ম থেকে আসে জ্ঞাননিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে পরাজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান থেকে মুক্তি বা মোক্ষ। বেদান্তে কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়-সাধন করা হয়েছে। ভক্তিমার্গের কথা সেখানে গৌণ। গীতা—জ্ঞান-কর্ম ও ভক্তিমার্গের নির্দেশিকা। এইসব দার্শনিক কূটতর্কের নিবিড় অরণ্য পেরিয়ে রবীন্দ্রমানস উপলব্ধির শান্ত-প্রান্তরে বিহার করেছে। সেই উপলব্ধি জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, যদিও সে ভক্তি কখনও উচ্ছল বা তরঙ্গিত হয়ে উঠেনি। জ্ঞান ও ভক্তির যে শান্তরস—সেই রসের রসিক রবীন্দ্রনাথ। 'নৈবেদ্য'র একটি কবিতায় কবির সেই ভক্তির ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে—

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃতগীত গানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।
দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধসুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসার ভবনদ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ়, গভীর, সর্বকর্মে দিনে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দ কল্যাণে। সর্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্বদুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্বসুখে দীপ্তি

দাহহীন।

সম্বরিয়া ভাব অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।' "নৈবেদ্য-৪৫"

ঔপনিষদিক জ্ঞানমার্গে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বব্যাপকত্ব বা সর্বেশ্বরত্ব প্রতিপাদিত। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানা বুদ্ধি দিয়ে, বিচক্ষণতা দিয়ে জানা। জ্ঞানমার্গের জ্ঞান—দার্শনিক জ্ঞান। এই জ্ঞান বিশ্বস্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি বিশ্বকে নিয়ে। জ্ঞানে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক করে দেখা হয়। জড় বিজ্ঞান (Science) সৃষ্টির মূলীভূত উপাদানগুলিকে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন করে দেখে। অর্থাৎ বিশ্বের নানা বিভাগ সম্পর্কে বিশ্লিষ্টভাবে জ্ঞান আহরণ করে তার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে আসে। আর দর্শন বিশ্বসৃষ্টিকে সমগ্রতার দৃষ্টিতে দেখে।

জ্ঞানমার্গে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। অদ্বৈতত্ত্ব যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। অনুভূতির স্থান গৌণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিনের মিলিতস্বরূপ ওঙ্কারই ব্রহ্ম। এক তিনিই আবার শক্তিযোগে বহু—'বহুধঅ শক্তি যোগাৎ।' (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১) দৃশ্যজগতের অন্তরালে নিহিত গুহায়িত যে এক সর্বব্যাপী শক্তি সৃষ্টিকে নিয়ত পরিচালিত করছেন তিনিই ব্রহ্মা। তিনি এই জগতের প্রতিটি অণু পরমাণুকে আচ্ছন্ন করে আছেন—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' (ঈশ ১)। তিনি অণু হতেও অনুতর, মহৎ হতেও মহত্তর—'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান'। (শ্বেতাশ্বতর ৩।২০, ষষ্ঠ ২।২০) উপনিষদের ঋষি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, দ্যুলোকে, ভূলোকে, পাদপে, লতা-পাতায় সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন—

'যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ। (হ্বেতাশ্বতর ২।১৭)

এ যেন বৈষ্ণবের 'যাঁহা যাঁহা নেত্রনড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে।' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অর্থাৎ নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়। ঈশ্বর অন্তর্যামী, 'সর্বভূতান্তরাত্মা', 'সর্বানুভূঃ', 'সর্বভূতগুহাশয়'—সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ (শ্বেতাশ্বতর ৩।১১)। —তাঁকে জানা মানেই এককে জানা। আর একেশ্বরকে জানা মানেই নিজেকে জানা, আত্মাকে জানা। আত্মাকে জানাই তো আত্মোপলব্ধি (Self realisation)। উপনিষদ তাই বলেছেন, জানো সেই এককে, আত্মাকে—'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ (মুণ্ডক ২।২।৫)

কোনোপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপের কথা বলা হয়েছে। তিনি শ্রোত্রেও শ্রোত্র, মনেরও মন, বাক্যের বাক্য (কেন ১।২), তথাপি তিনি চক্ষু, বাক্ ও মনের অগম্য (কেন ১।৩)। তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরিচালনা করেন অথচ নিজে তাদের দ্বারা পরিচালিত হন না, এমনই অদৃশ্য, অস্পর্শনীয়, বিশ্বব্যাপী শক্তিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভবেদ্য। তাঁকে বাইরে প্রকাশ করা যায় না কারণ তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। উপনিষদ্ এইজন্য বলেছেন যে আমরা তাঁকে জানি না এমন নয়, আবার জেনেছি এমনও নয়। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যিনি তাঁকে জেনেছেন তিনিই তাঁকে জেনেছেন—অপরকে তিনি তা জানাতে পারেন না (কেন ২।২)। আবার যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তাঁকে (ব্রহ্মকে) জেনেও তাঁর সীমাহীন বৈভবের কথা চিন্তা করে তাঁর স্বরূপ প্রকাশে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন (ঈশ ২।৩)। মৈত্রেয়ীর সেই জ্ঞানদৃপ্ত অভিযোগ 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ (বৃহদারণ্যক)। —'যা দিয়ে আমি অমৃতকে পাবো

না, আত্মারূপী ব্রহ্মকে পাবো না, তা দিয়ে আমি কি করবো? উপনিষদও বলেছেন, 'এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি পেতে হলে তাঁকে জানতে হবে নতুবা পুনঃ পুনঃ জরাজনিত মৃত্যুফল ভোগ করতে হবে (কেন ২।৫)।

উপনিষদে যে বিশ্বমহাজাগতিক শক্তিকে (all pervading eternal energy) ঈশা বলা হয়েছে তাঁর আর-একটি বৈশিষ্ট্য তিনি রসঘন, প্রেমঘন এবং আনন্দঘন। তিনি সচ্চিদানন্দময়। সত্য ও সুন্দরের জ্ঞানময় ও আনন্দময় বিভু তিনি। আনন্দ থেকেই জীবজগতের সমুদয় প্রাণীর উদ্ভব, বিকাশ ও বিনষ্টি—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দংপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩।৬)

মানুষের সত্তার দুটি দিক—একটি তার অহং, অপরটি তার আত্মা। অহং-এর স্থূল আবরণ মুক্ত হলেই আত্মার বিকাশ ঘটে। জীব তখন অমৃতের স্পর্শ পায়, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সত্যানুভূতি লাভ করে।

বেদান্ত আত্মোপলব্ধির বাণীতে পূর্ণ। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্ (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫)। ভীরু বা দুর্বলের দ্বারা আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয় না। সেজন্য উপনিষদ বলেছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ) ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' (মুণ্ডক ২।৪)। আত্মোপলব্ধি হলে সাধক ভূমানন্দ সুখ অনুভব করেন। এর থেকে বড়ো সুখ আর কি আছে? উপনিষদ তাই বলেছেন, 'ভূমৈব সুখম্' (ছান্দোগ্য ৭।২৩।১)।

ঈশানুভবে অহং ও আত্মা এক হয়ে যায়। 'তৎ ত্বমসি' —অর্থাৎ জীবই তখন ঈশ্বর এই অদ্বয়বোধ জন্মায়। জীব তখন শিবত্ব লাভ করে। সে বলতে পারে, "আঁধারের পারে মহান্ত পুরুষকে জেনেই আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করেছি" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮)।

৪০৪.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। পাশ্চাত্য দর্শনের বস্তুবাদী চেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চেতনার ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলি বিশ্লেষণ করে দেখাও।

২। রবীন্দ্র জীবনদর্শন তার কাব্যধারায় কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

ডিএসই-৪০৪

বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ৩

বেদান্ত দর্শন

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.১.৩.১ : বেদান্ত দর্শন

৪০৪.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৪.১.৩.১ : বেদান্ত দর্শন

এই তো উপনিষদ দর্শনের সারাৎসার। রবীন্দ্র দর্শনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও বৈষম্য কোথায়? রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানমার্গকে স্বীকার করেও অনুভূতিমার্গের কথা পল্লবিত করে বলেছেন। তিনি মনে করেন, জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমিত। তাতে মানুষের বাইরের পরিচয় যতই থাক, অন্তরের পরিচয় থাকে না। এ ছাড়া, "জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না। আগুন গরম, সূর্য গোল, জল তরল—ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়, দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নুতন শিক্ষার মতো জানাইতে আসে তবে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বার বার অনুভব করিয়া শ্রান্তি বোধ হয় না।" অনুভূতির কথা উপনিষদেও আছে, গৌণরূপে আছে। "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্‌বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ"। (কেন ২।২)। —মন্ত্রের মর্মার্থ ঈশ্বর বা পরমপুরুষ অনুভববেদ্য। রবীন্দ্রনাথ যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণ (মনন) অপেক্ষা অনুভূতি পথের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। কারণ তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় এবং মুখ্য পরিচয় তিনি কবি; আগে কবি, পরে দার্শনিক। উভয়ের সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যও যেমন আছে, বৈষাদৃশ্যও তেমনি।

কবি ভাবজগতের মানুষ। ভাব বা অনুভূতির রাজ্যে যুক্তিতর্কের বিশেষ স্থান নেই। কল্পনার আলোকে কবি দর্শন করেন এই জগৎ ও জীবনকে। অধরাকে, অনন্তকে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরম রহস্যকে গোচর করতে চান অনুভবের সহায়তায়। অনুভূতি হৃদয়ের দ্বারা প্রশস্ত করে দেয়। সেই আলোকে কবি যা প্রত্যক্ষ করেন তাই তাঁর কাছে সত্য প্রতিভাত হয়। মানসরাজ্যে যা ঘটে, কবির সত্য তাই। বস্তুগত সত্যতা কবিদের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য নয়। এদিক থেকে দার্শনিকের সত্য ভিন্ন। দার্শনিকের সত্য অনুভূতি সাপেক্ষ নয়, যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ বা মনন সাপেক্ষ। কল্পনা বা অনুমানের পরিধি সেখানে সংকীর্ণ। রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির অনুভব ও দার্শনিকের মনন দুয়েরই

প্রকাশ ঘটেছে।" তবে মনন সেখানে শুধু যুক্তি-বিশ্লেষণ নির্ভর না থেকে ভাবরূপ ধারণ করেছে। ভাবজগতের মানুষের পক্ষে অনুভূতির প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। এজন্য দেখা যায়, কবি সমালোচক রবীন্দ্রনাথ কবি ও প্রাবন্ধিকরূপে অভিন্ন। অর্থাৎ যুক্তিধর্মী সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর স্বভাবসুলভ কবিমনের প্রকাশ ঘটেছে।

অনুভূতির ভক্ত হলেও জ্ঞান ও কর্মমার্গের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। একটি গানে তিনি 'ভজন-পূজন সাধন-আরাধনা' ছেড়ে, কর্মযোগে ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভের কথা বলেছেন, "কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে" (গীতাঞ্জলি, ১১৯)। একাধারে তিনি কবি-দার্শনিক বলেই তাঁর বক্তব্যে পরস্পরবিরোধী ভাবও (Contradictions) স্বাভাবিক ছিল। কোনো বিশেষ মত ও পথের প্রতি গোঁড়ামি ছিল না বলে তাঁর দার্শনিক চিন্তায় পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মার্গের কথা নানাভাবে এসে গেছে। সেইজন্য কবির অনুভূতির পথকে শুধু ধ্যান বা যোগের পথ বললে ঠিক বলা হবে না। তাঁর অনুভূতির পথ ধ্যান-যোগ মিশ্রিত বিমিশ্র প্রেমের পথ।

প্রেমে আমরা যা কিছু জানি নিবিড় করে জানি। কিন্তু "মনন শক্তির সাহায্যে আমরা জ্ঞেয়কে জানি মাত্র; তাকে পাই না, প্রেমসিক্ত অনুভূতিতে আমরা জ্ঞেয়কে পাই। জ্ঞেয় সেখানে প্রেমাস্পদরূপে আমাদের নিকট ধরা দেয়।" মনন যে সত্যকে জানায় তাতে আছে বৈদগ্ধ্যের পরিচয়; প্রেম যে সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করে তাতে আছে আনন্দ। 'শেষ সপ্তক'-এর দুটি কবিতায় প্রেমিক ও পণ্ডিতের সত্যোপলব্ধির পার্থক্যটি রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে দেখিয়েছেন। 'শুকতারা'কে উপলক্ষ্য করে কবি বলেছেন—

"হে পণ্ডিতের গ্রহ
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মানবই
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য তার চেয়েও সত্য
যেখানে তমি আমাদেরি
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা
যেখানে তুমি ছোট্ট, তুমি সুন্দর
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর
সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে, মানব-পথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।" ('শেষ সপ্তক—আটাশ)

'শেষ সপ্তক'-এর সতেরো সংখ্যক কবিতার একটি অনুচ্ছেদে ওই কথাটিই কবি নতুন করে বলেছেন—

"আমি যে জানি
একথা যে মানুষ জানায়
বাক্যে হোক সুরে হোক, রেখায় হোক

সে পণ্ডিত।
আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি,
একথা যার প্রাণ বলে
গান তারি জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও
তার নাড়িতে বাজে সুর।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্র কবিসত্তায় বৈদগ্ধ্যে ও প্রেমের যুগ্ম প্রকাশ ঘটলেও কবির আনন্দময় প্রেমিকসত্তাটিই বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে।

সৃষ্টিরহস্য ও বিশ্বের গঠন নিয়েও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি মত আছে, যা উপনিষদের চিন্তাধারার সঙ্গে এক হয়েও অভিনব। বিশ্বকে তিনি বিশ্লিষ্ট বস্তুর সমন্বয়রূপে দেখেন নি। বিশ্ব তাঁর কাছে ব্যাপক সত্তার বহুধা প্রকাশ।

"আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন,....." ('রোগশয্যা'—২১)

রবীন্দ্রনাথের অভিনবত্ব হল, তিনি বিশ্বসত্তা বা পরমসত্তাতেও ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। পরমসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা পৃথক। কিন্তু পরমসত্তা ও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট বলে তাঁর সঙ্গেও মানবিক সম্পর্ক পাতানো যায়। পরমসত্তা সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁকে পেতে হলে বাইরে জগতে উপাসনা করে লাভ নেই, অন্তরের মধ্যে, হৃদয়রাজ্যে তাঁকে পেতে হবে। কারণ আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার লীলানিকেতন। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম, সত্যতম বিকাশ। সুতরাং নরদেবতারূপ বিশ্বমানবের উপাসনা করতে হবে। তাঁদের ভালোবাসলেই বিশ্বেশ্বরকে ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের এটাই সার কথা।

নরদেবতার পরিকল্পনা করে রবীন্দ্রনাথ 'সর্বেশ্বরবাদী' এক দর্শন সৃষ্টি করলেন। তাঁর এ দর্শনের সঙ্গে উপনিষদের কোনো আপাত বিরোধ নেই। কিন্তু ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সেই পরমসত্তার সঙ্গে 'তুমি', 'আমি'র সম্পর্ক পাতানো, তাদের মধ্যে সনাতন সামঞ্জস্য বিধান উপনিষদের অদ্বৈতবাদের কথা নয়। অদ্বৈতবাদকে অবলম্বন করেই 'সর্বেশ্বরবাদ'। তাতে একদিকে ব্যক্তি, অন্যদিকে বিশ্ব। রবীন্দ্রনাথ এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন অসীমকে (বিশ্বকে) সীমার (ব্যক্তির) মধ্যে নিয়ে এসে এবং সীমাকে অসীমের মধ্যে বিলীন করে দিয়ে। এইভাবে ব্যক্তি এবং বিশ্বের মধ্যে কবিচিত্তের যে নিত্যলীলা তাতে অদ্বৈতবোধ জন্মায় না। সুতরাং, তিনি দ্বৈতবাদী হয়ে পড়েন। এই পরস্পর বিরোধী ভাবের জন্য মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদীয় অদ্বৈতবাদী কিংবা বৈষ্ণবীয় দ্বৈতবাদী ইত্যাদি না বলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলা যুক্তিসঙ্গত। কখনো তিনি দ্বৈতবাদী, কখনো অদ্বৈতবাদী। কোনো দার্শনিক মতামতকেই তিনি অস্বীকার করেন নি। সেজন্য তাঁকে 'সর্বসমন্বয়বাদী'ও বলা চলে। সাহিত্য চিন্তায় তিনি 'আনন্দবাদী'। এই বিশ্ব আনন্দময় ঈশ্বরের লীলানিকেতন। এই অনুভব একটি গানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

"প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।" (ব্রহ্মসঙ্গীত-৬। গীতাঞ্জলি। স্বরবিতান-২৬)

সুতরাং, তাঁর 'আনন্দবাদ' 'সর্বেশ্বরবাদেরই' নামান্তর।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের জন্য কর্মের প্রয়োজন। সেই কর্ম হবে বিশ্বজনীন কর্ম। বিশ্বজনীন কর্মই পরমাত্মার উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপায়। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞান ও কর্মকে প্রেমানুভূতির সহায়ক রূপে কাজে লাগিয়েছেন। এইভাবে তাঁর মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতি (বা প্রেম)—তিন মার্গের একটা সমন্বয় গড়ে উঠেছিল।

৪০৪.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রচলিত ধর্ম-সংস্কারকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই মানবতাবাদী (Humanist) দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন।—দৃষ্টান্তসহ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

২। ঔপনিষদিক আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবন ও বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনে কীভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করো।

ডিএসই-৪০৪
বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য
পর্যায় গ্রন্থ : ১
একক ৪
উপনিষদ ও রবীন্দ্রমানস

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.১.৪.১ : শিলাইদহ পর্ব

৪০৪.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৪.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪০৪.১.৪.১ : শিলাইদহ পর্ব

মানসিকতা ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাব-সাযুজ্য অনুমিত হয়। বৈদিক ঋষিকবির মন আর রবীন্দ্রনাথের কবিমন যেন একই ভাব ও সুরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালের ব্যবধান সেই ভাব-সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে কিন্তু বৈপরীত্য সৃষ্টি করে নি।

বৈদিক কবি সর্বভূতে একটি প্রাণবান্ সত্তাকে বা অক্ষরপুরুষ ব্রহ্মাকে দর্শন ও অনুভব করেছিলেন (শ্বেতাশ্বতর ২।১৭)। আর রবীন্দ্রনাথও প্রাণময় চেতনার অনুসন্ধান করতে গিয়ে চেতনাচেতন সর্বভূতে ব্রহ্মাকে অনুভব করেছেন। 'বাংলা ভাষার পরিচয়', 'আত্মপরিচয়', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধে ঋকসংহিতা ও অথর্বসংহিতার বহু মন্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'দেবীসুক্ত', 'উষাসুক্ত', 'মধুশ্লোক', 'হিরণ্যগর্ভসুক্ত', অথর্ববেদের 'পুরুষসুক্ত (আ ১০।২ ও 'পৃথিবীসুক্ত' (আ ১২।১) বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন। সংহিতার ঋষিকবির মর্ত্যপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেম জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গপ্রীতি ও মর্ত্যমমতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'Religion of Man' (1963) Chap, VI, p. 57-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"When I look back upon those days, it seems to me that unconsciously I followed the path of my vedic ancestors and was inspired by the tropical sky with its suggestion of an uttermost beyond."

সত্যদ্রষ্টা 'ঋষিকবি' পরমসত্যের স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথেরও জীবনসাধনায় সত্যান্বেষণ-স্পৃহা প্রবল ছিল। বৈদিক ঋষিকবি সত্যকে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন করে অনুভব করেন নি। পূর্ণ ও সমগ্রের মধ্য দিয়ে

সত্যকে তাঁরা দর্শন করেছিলেন। বৈদিক ঋষির বোধিজাত এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সহজাতভাবে গড়ে উঠেছিল। সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবির মতো তিনিও বলেছেন, "বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক খণ্ড পদার্থ, প্রত্যেক খণ্ড ঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়ি উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি—তাহার চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেইক্ষণেই, সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখিতে পাই—'নিখিলে তব কী মহোৎসব। বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।' সত্যোপলব্ধিতে বিশ্বাসের এই সাযুজ্য কত গভীর তা সহজেই অনুমেয়। আসলে রবীন্দ্রনাথের যা স্বধর্ম অর্থাৎ তাঁর কবিধর্ম তা উপনিষদের আদর্শ ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য যেখানেই তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই কোনো না কোনোভাবে উপনিষদের কথা এসে গেছে।

উপনিষদের একটি সাধারণ কাহিনীও (ছান্দোগ্য ৪।৪) রবীন্দ্র-প্রতিভায় মায়াস্পর্শে কেমন অভিনব ও সুন্দর হয়ে উঠেছে, 'কথা' কাব্যের অন্তর্গত 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটিতে তার পরিচয় আছে। সত্যকাম গুরু গৌতমকে তার সত্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "বৎস, সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণের ধর্ম; তুমি সত্যকথা অকপটে বলেছ, সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণ। আমি তোমাকে উপনীত করব, সমিধ সংগ্রহ কর"। (ছান্দোগ্য উপনিষদ)।

রবীন্দ্রনাথ মূলের বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন; ফলে 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি অনেকটা অনুবাদমূলক হয়ে পড়েছে। যেমন জবালা সত্যকামকে বলেছিলেন, "বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে" ইত্যাদি, —এই অংশটুকুর বর্ণনা 'ব্রাহ্মণ' কবিতায়—

"যৌবন দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি তাত।"

তবুও কাব্যমূল্যে কবিতাটি অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। কবিতাটির ভূমিকায় একটি সুন্দর চিত্রকল্প প্রাচীন তপোবনকেন্দ্রিক সভ্যতার যুগটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। গোত্রহীন সন্তানকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করে, মাতৃত্বের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দান করে এবং পরিশেষে সত্যসংকল্প ব্রহ্মচারীর সত্যস্বরূপকে তুলে ধরে, গৌতম মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গৌতমের কথায় 'যিনি সত্যে স্থিত তিনিই ব্রাহ্মণ।' একই কথা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও বাণীরূপ লাভ করেছে—

"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

আধুনিক গতিবাদ বলে, জগতের কোনো কিছু স্থাবর নয়; সবকিছুর মধ্যেই একটা অবিরাম গতিশীলতা, একটা চলার ভাব আছে। একই কথা বহুকাল আগেই বলেছিলেন উপনিষদের ঋষি। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' শুনঃশেপের উপাখ্যানে বিশ্বের' গতিচ্ছন্দের সঙ্গে রেখে মানুষকেও অবিরাম চলার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় এই গতিশীলতা বিপুল প্রেরণা সঞ্চায় করেছে। কবির উপাস্য ব্রহ্ম নিয়ত পরিবর্তমান —গতিশীল। তাঁরই অলক্ষ্য আহ্বানে কবির নিরুদ্দেশ যাত্রা। তাই জীবনসাধনায় তিনি কখনও স্থির হয়ে বসেন নি। তাঁর জীবন-রথ অবিরাম ছুটে চলেছে নিরুদ্দেশের দিকে—

"ভাবি নাইকো কেন কিসের লাগি
ছুটে চলে এলেম পথের পরে।
নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতিপদেই অন্তর উৎসুক
অজানা কোনো নিরুদ্দেশের তরে।" —'পথের শেষ' ('খেয়া)

জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে লক্ষ্যহীন রেগে এই যে অবিরাম ছুটে চলা তাতে কবিচিত্তের বিরাম-বিশ্রান্তি নেই। বরং লক্ষ্যহীনতার রোমান্স তাঁর মনে একপ্রকার সুখানুভূতির সৃষ্টি করেছে। অজানা, অচেনা সেই সুখের জন্য সকল জড়তা ও সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে কবিচিত্ত মুক্তির উল্লাসে এগিয়ে যেতে চেয়েছে।

জীবজগৎ ও প্রকৃতিজগতের মধ্যে নিয়ত গতিশীলতার ভাবটি কবি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে। যেমন—

"পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে   পাখা মেলি
        মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
        আকাশের খুঁজিতে কিনারা।" প্রভৃতি (বালাকা, ৩৬)

দেখা যাচ্ছে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই গতিতত্ত্ব—এই অবিরাম গতিশীলতার স্পষ্ট ছায়া পড়েছে বলাকার কবিতায়। অথচ এদেশের কিছু বিদগ্ধ মনীষীর ধারণা, উনিশ শতকের দার্শনিক বের্গসঁ প্রবর্তিত নবোদ্ভূত গতিবাদ তত্ত্বের (Transendentalism) প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ বলাকার কবিতাগুলি রচনা করেন। আমাদের মনে হয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গতিবাদ, বের্গসঁর দার্শনিক মতবাদ ও কবির নিজস্ব মননে সমৃদ্ধ হয়েই বলাকার মনোজ্ঞ কবিতাগুলি এমন গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে।

ঋগ্বেদের কবিত্বময় 'ঊষাসূক্তে' (ঋগ্বেদ ১০.১২৭) ঊষা ও রাত্রি অভিন্নরূপে কল্পিত। ঊষা মহতী দেবী, তরুণী মাতৃময়ী এবং সুপ্তি ও শান্তিস্বরূপা—'জগতো নিবেশনীম্।' ঋষিকবির এই কল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রকল্পনার সাদৃশ্য দেখা যা। যেমন ঊষার বর্ণনা—

"হে ঊষা তরুণী
নিশীথের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্ত্রস্বর শুনি
যেমন উঠিলে জেগে।" .....প্রভৃতি। —('দান'; 'বিচিত্রতা')

রাত্রি সম্বন্ধে মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য—"এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপর টানিয়া দেয়।..... রাত্রির নিস্তরঙ্গতার মধ্যে আছে গভীর মিলনের আনন্দ। রাত্রি

আমাদের সব কিছু হরণ করে না বরং নতুন করে প্রেরণা দেয়—জগৎকে আপনার বলে একান্ত করে অনুভবের প্রেরণা—একান্ত নির্জনে মিলনের মধ্যে আত্মস্বরূপকে গভীরভাবে উপলব্ধির প্রেরণা। আমাদের জন্য 'বিরাম ও বিশ্রামের নীড়' রচনা করে রাত্রি। রাত্রির স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে কবিচিত্ত মগ্ন হয়েছে, বলেছে, "হে বিরাম বিভাবরীর ঈশ্বরী মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায় লুণ্ঠিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জন দিব, কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিত্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব, কোনো চেষ্টা করিব না, কেবল তোমার ইচ্ছায় আমরা ইচ্ছাকে বিলীন করিব, কোনো বিচার করিব না, কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব, যে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।" —রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে পরম আনন্দময়ের এই যে সান্নিধ্য এই অনুভূতি শুধু বেদ উপনিষদ লালিত নয়, হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে উত্থিত মৌলিক অনুভূতিও। এমনিভাবেই রবীন্দ্রকল্পনা ভাব থেকে ভাবাতীতের অমরাবতী স্পর্শ করেছে। 'কল্পনা' কাব্যের 'রাত্রি' কবিতাটিও বৈদিক রাত্রি বর্ণনার ছায়ায় রচিত একটি অভিনব কবিতা।

রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ স্পর্শের মধ্যে আলোকে-অন্ধকারে, অণু-পরমাণুতে যে দিব্যচেতনার স্পর্শ কবি অনুভব করেছেন প্রকৃতির দিক দিয়ে তা বৈদিক ঋষিদের অনুভবের সমতুল। চেতনার সর্বব্যাপী বিস্তার ঔপনিষদিক সত্য। শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি নেই, তা তাঁর সারা জীবনের একটি বিশিষ্ট প্রত্যয়ের মহিমা লাভ করেছে এবং কল্পনার বৈচিত্র্য তাকে অভিনবত্ব দান করেছে। নতুন সত্যের আলোকে জগৎকে দেখে কবি গান গেয়ে উঠেছেন, "স্থলে জলে আর হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

রবীন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক। তাঁর ধর্মজীবন ও কবিজীবন একবৃন্তে বিধৃত। কবিধর্মই তাঁর স্বধর্ম। নতুন কোনো ধর্মের প্রবক্তা তিনি নন। তিনি হৃদয় ধর্মের উপাসক, মার্মিক—ভাবুক। উপনিষদের দার্শনিক অংশটি তাঁকে মুগ্ধ ও বিচলিত করেছিল। তাই ঔপনিষদিক ভাবরসে আপ্লুত হয়ে আনন্দলোকের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে খুঁজেছিলেন। 'আত্মপরিচয়ে' তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, "আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি, ভালো লাগল আমার।" সুতরাং তাঁর ধর্ম একান্তই কবিধর্ম। উপনিষদের আলোকে সেই ধর্মের অভিপ্রকাশ মাত্র। 'The religion of an Artist—গ্রন্থে কবি স্বীকার করেছেন তাঁর কবিধর্মের কথা।

রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম শুধুমাত্র তাঁর কবিজীবনের সত্য নয়, সমগ্র সাহিত্যজীবন ও কর্মজীবনের সত্য। মানব মনের নানা চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ নিয়েই সাহিত্য। ব্যক্তিগত ভাবনা বিশ্বগত না হলেও মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির মহতী প্রেরণায় এবং প্রকাশের ইচ্ছায় নিখিল মানব প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পী যোগ স্থাপন করতে চায়। ব্যক্তি-আত্মার সঙ্গে বিশ্ব-আত্মার এই যোগের কথা ঋগ্বেদে আছে। সে কথার উল্লেখ করে 'আত্মপরিচয়'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে কবি লিখেছেন, "ঋগ্বেদে আছে, 'অভ্রাতৃব্যো অনাত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে। —হে ইন্দ্র, তোমার শত্রু নেই, তোমার নায়ক নেই, তোমার বন্ধু নেই, তবু প্রকাশ হবার কালে যোগের দ্বারা বন্ধুত্ব ইচ্ছা করে।" ব্যক্তি জীবনে রবীন্দ্রনাথও এই সত্যটি অনুভব করেছিলেন—'সত্য ভাবে প্রকাশ পেতে হলে বন্ধুতা চাই, আপনাকে ভালোলাগানো চাই। ভালো লাগাবার জন্য নিখিল বিশ্বে তাইতো এত অসংখ্য আয়োজন। তাইতো শব্দের থেকে গান জাগছে, রূপের থেকে অপরূপতা।"

৪০৪.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। উপনিষদ কিভাবে রবীন্দ্রজীবন দর্শনকে প্রভাবিত করেছে, বিশ্লেষণ করো।

২। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চিন্তার উন্মেষের পরিচয় দাও।

৪০৪.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (একক ৯ থেকে একক ১২)

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী-১৯৬১—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (১-২ খণ্ড, ১ম সং)—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৩। উপনিষদ—বিধুশেখর ভট্টাচার্য।

৪। উপনিষদ প্রসঙ্গ (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী)—শ্রীঅরবিন্দ।

৫। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (ঈশ-কেন-কঠ)—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

৬। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (উদ্বোধন)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

৭। উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস (১ম সংস্করণ, ১৩৬৮)—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৮। Indian Philosophy—Dr. S. Radhakrishnan।

৯। Religion of Man—Rabindranath Tagore।

ডিএসই-৪০৪

বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক ৫

ব্রহ্মবিদ্যা—আনন্দব্রহ্ম ও রবীন্দ্রবোধ

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.২.৫.১ : ব্রহ্মবিদ্যা—আনন্দব্রহ্ম ও রবীন্দ্রবোধ

৪০৪.২.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৪.২.৫.১ : ব্রহ্মবিদ্যা—আনন্দব্রহ্ম ও রবীন্দ্রবোধ

রবীন্দ্রভাবনায় কবিসৃষ্টির প্রকাশ আনন্দরূপে। কাব্যসাহিত্য জাগতিক অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন চরিতার্থ করে না, শুধু আনন্দ দেয়—অনাবিল আনন্দ, প্রয়োজনের অতীত আনন্দ। এই আনন্দের স্বরূপ চির অম্লান। কবি বলেছেন, "সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে এইখানেই, এই সংসারের অনাবশ্যক মহলে। ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাতে এসেছি যে যোগ বন্ধুত্বের যোগ। জীবনের প্রয়োজন আছে অন্নে বস্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দরূপে অমৃতরূপে। সেইখানে জায়গা নেয় ইন্দ্রের সখারা—

অস্তি সন্তং ন জহাতি,
অস্তি সন্তং ন পশ্যতি।
পশ্য দেবস্য কাব্যম্
ন মমার ন জীর্যতি।—

"কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু দেখো সেই দেবের কাব্য সে কাব্য মরে না, জীর্ণ হয় না।" সাহিত্য যে আনন্দ দেয়, তা যে অমৃত (যা মরে না) এবং প্রয়োজনের অতীত—এই প্রত্যয়ের অনুবর্তন বৈদিক ঋষিকবির মতো রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। স্রষ্টার আনন্দনিকেতন এই সৃষ্টি। স্রষ্টাই সৃষ্টির মধ্যে আনন্দরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশের দেবতাও তিনি, তিনি 'আবিঃ (স্বপ্রকাশ)। তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ প্রকাশ কবির কাব্যে। ঋষিকবি প্রকাশ স্বরূপকে কবিদৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। প্রয়োজন বহির্ভূত আনন্দের—কাব্যানন্দের ভিতর দিয়ে মানুষ সেই প্রকাশস্বরূপের সান্নিধ্য পেতে পারে। যিনি 'আবিঃ' তিনি সমস্ত

নিয়মজালের বাহিরে। কোনো প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর সঙ্গে মানবচিত্তের যোগ স্থাপিত হয় না। কেননা তিনি যে প্রয়োজনের অতীত। আনন্দের যোগেই তাঁর সঙ্গে যোগ।

ব্যক্তিজীবনে সংসারের নানা ব্যবহারিকতার মাঝে থেকেও রবীন্দ্রনাথের কবিমন বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছিল। পরিশেষে তাঁর কবিসত্তা সৃষ্টির অতীত রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্রষ্টার প্রকাশ বিশ্বসৃষ্টিকে নিত্যকাল ধরে নতুন করে প্রকাশের ইচ্ছা জেগেছে তাঁর মনে। একথা স্মরণ করেই 'আত্মপরিচয়'-এ কবি লিখেছেন, "...এই সমস্ত ব্যবহার মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমরা মন যুক্ত হয়ে গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।"

বিশ্বসৃষ্টি ও স্রষ্টার সঙ্গে কবিচিত্তের আনন্দের যোগ কর্মজীবনেও ব্যাপ্ত নানা কাজের মাঝেও তিনি কবির আনন্দ অনুভব করেছিলেন। কবি বলেছেন, সে কর্ম "লোহালকড়ে বাঁধা যন্ত্রশালার কর্ম নয়। কর্মরূপে সেও কাব্য। একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কাব্যক্ষেত্রে; আহ্বান করেছিলুম এখানকার জল-স্থল-আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম আক্ষ্ম নন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎসব-প্রাঙ্গণে উদ্‌বোধিত করেছিলুম।" —এই স্বীকৃতিই প্রমাণ করে ঋষিকবির আদর্শ কত গভীরভাবে রবীন্দ্রনাথকে অতিভূত করেছিল। শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা করে তিনি একদিকে যেমন আহ্বান করেছিলেন 'প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ' অপরদিকে তেমনি ইচ্ছা করেছিলেন 'মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ করে তুলতে।' কর্মজগতে রবীন্দ্রনাথ ধীর ও আনন্দের সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে অবহেলা করেন নি। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সমন্বয়সাধনের এই প্রয়াসেও ঋষিকবির চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের চিন্তাধারার সাযুজ্য আছে। এই সাযুজ্য স্বীকার করে 'আত্মপরিচয়'-এ কবি লিখেছেন, "বেদে আছে—যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন স ধীনাং যোগমিন্বতি। অর্থাৎ যাকে বাদে দিয়ে বড়ো বড়ো জ্ঞানীদেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না তিনি বুদ্ধি যোগের দ্বারাই মিলিত হন, মন্ত্রের যোগে নয়, জাদুমূলক অনুষ্ঠানের যোগে নয়। তাই ধী এবং আনন্দ এই দুই শক্তিকে এখানকার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করেছি।"

প্রকাশের ব্যাকুলতায় গীতি ও ধর্মের পথে কবি রূপের মধ্যে অরূপকে, 'সীমার মাঝে অসীম'কে এবং সান্তের মধ্যে অনন্তকে পেতে চেয়েছিলেন। সত্য শিব ও সুন্দরের সঙ্গলাভের জন্য কবির হৃদয়তন্ত্রে 'রম্যবীণা'র নিক্কণ ধ্বনিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্ময় সত্তার প্রকাশকে তিনি সকল রূপে সকল প্রাণে অনুভব করেছেন। 'রম্যবীণা'র ঝংকারের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা যেন সৃষ্টিতে নিজেকেই প্রককাশ করতে চাইছেন। কবি লিখেছেন, "কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে—বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে। ... এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে একপথ দিয়েই গ্রহণ করতে পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয়। চোখ দিয়ে কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে নানা দিক দিয়ে তাকে নানা রকম করে নিই। এই একতান মহাসঙ্গীতকে আমরা দেখি, শুনি, শুঁকি, আস্বাদন করি।"

সমগ্র জীবন ধরে তিলে তিলে তিনি সত্যের স্বরূপকে অনুভব করেছেন। কোনো বিশেষ মতবাদের কঠোর বিধিবিধান দ্বারা তিন সত্যকে যাচাই করেন নি। সত্যের খণ্ডরূপকে নয়, পূর্ণরূপকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন। অনুভূতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি একটি সামঞ্জস্য, একটি ঐক্য অনুভব করেছেন। এই ঐক্যানুভূতির মধ্যেই কবির প্রত্যেক স্বরূপ বিধৃত। 'আত্মপরিচয়'-এ কবি তাঁর ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, "ঠিক যাকে সাধারণে

ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়,—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নুতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশঃ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব—আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্যে পল্লবিত তা নয়; এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।" উপনিষদের মুখ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যার দুটি দিক—একটি তত্ত্বের, আর-একটি সাধনার। বিভিন্ন মুখ্য উপনিষদগুলিতে তত্ত্ব এবং সাধনা—দুয়ের কথাই আলোচিত হয়েছে। উপনিষদের সবচেয়ে বড়ো কথা ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিয়ে একদিন মহর্ষি ভৃগু তাঁর পিতা বরুণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন—"ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরং উপসসার। অবীহি ভগবো ব্রহ্মেতি" (তৈত্তিরীয় ৩।১)। উত্তরে বরুণ বলেছিলেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব। তৎ ব্রহ্মেতি" (তৈত্তিরীয় ২।৩।১)। —"যেখান থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি, যাঁকে অবলম্বন করে, যাঁকে আশ্রয় করে বিশ্বের ভূতবর্গ জীবিত আছে এবং বিশ্বের সমস্ত ভূত আবার যেখানে বিলীন বা লয়প্রাপ্ত হয় তাই ব্রহ্ম।" 'ব্রহ্ম' অর্থ হচ্ছে 'বৃহৎ'॥ এই বৃহতের মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত।

আনন্দই ব্রহ্ম—এই সবচেয়ে বড়ো কথা এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'আনন্দ সংবাদ' উপনিষদের পরম জ্ঞাতব্য। এই কথাই উপনিষদে ছড়ানো রয়েছে। ব্রহ্ম রসস্বরূপ। রসস্বরূপ বলেই সবকিছুতেই আনন্দের প্রস্রবণ বয়ে যায়। রসের অনুভূতি না হলে আনন্দে পৌঁছোনো যায় না। উপনিষদ তাই বলেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদের আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"। (তৈত্তিরীয় ২।৭)।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ, সুমহৎ জীবনসাধনায় ওই আনন্দের উপলব্ধির কথা ঋষিকবিদের চেয়ে আরও ব্যাপক ও বিচিত্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'সঞ্চয়', 'মানুষের ধর্ম', 'শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম', 'ব্রহ্মমন্ত্র', 'ঔপনিষদিক ব্রহ্ম', 'আত্মপরিচয়' ইত্যাদি প্রবেন্ধ ও উপদেশমালায় এবং কাব্য, নাটক ও গানের মধ্যে বারে বারেই ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপের কথা এসেছে। অন্তিম রোগশয্যায় শুয়েও রবীন্দ্রনাথ একদিন এই মন্ত্র ধ্যান করেছিলেন—

"যাহা-কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে
তাহার চৌদিক হতে বাহু বেষ্টন
অপসৃত হয় যবে,
তখন সেবন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্নস্বরূপ।
শূন্য, তবু সে তো শূন্য নয়।
তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

—শূন্যতার ভিতর থেকেই তিনি পূর্ণের আনন্দকে লাভ করেছিলেন। মহাপ্রয়াণের আগে পর্যন্ত তিনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের মন্ত্র থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন; ব্রহ্মের রসঘন ও আনন্দঘন স্বরূপই তাঁর কাছে একমাত্র সত্য প্রতিভাত হয়েছিল। 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র কবিতা ও গানগুলির অধিকাংশই তো এই রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুধ্যান। 'সেঁজুতি'র একটি কবিতায়ও এই অনুভবের কথা সুন্দর করে বলেছেন—

"... ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী;
প্রত্যুত্তরে নানাছন্দে গেয়েছে সে 'ভালোবাসিয়াছি'।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার।..." 'সেঁজুতি' ঃ 'জন্মদিন।

ব্রহ্মের অনন্দস্বরূপের সঙ্গে ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপের উপলব্ধির কথা পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধগুলিতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।' 'সাহিত্য' প্রবন্ধে (দ্রষ্টব্য—'সাহিত্যের পথে') রবীন্দ্রনাথ 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্'-এর অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, উপনিষদের ব্রহ্মস্বরূপের ওই তিনটি পর্যায়কে আশ্রয় করে মানবাত্মারও তিনটি রূপ আছে। সেগুলি হল 'আমরা আছি', 'আমরা জানি' এবং 'আমরা ব্যক্ত করি'। ইংরেজি করে বললে দাঁড়ায়, 'I am, I know, I express–'। 'আমি আছি, এইটি হচ্ছে ব্রহ্মের সত্যস্বরূপের অন্তর্গত, 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞান স্বরূপের অন্তর্গত, 'আমি প্রকাশ করি' এটি ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপের অন্তর্গত।" আমাদের অস্তিত্ব; জ্ঞান এবং প্রকাশ বিধৃত হয়ে আছে সেই একেরই মধ্যে। উপনিষদের এই অদ্বৈততত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাস প্রাণ দিব দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

কিন্তু এই এক, অনন্ত সত্য প্রকাশ পাচ্ছে আনন্দরূপে, অমৃতরূপে—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডক ২।২।৭)। আনন্দময় ও অমৃতময় সত্তা ঈশ্বরের প্রেমময় সত্তা। সুতরাং স্রষ্টার প্রকাশ প্রেমে। প্রেমের অমৃত-বন্ধনেই এই বিশ্বসংসার গড়ে উঠেছে। বিশ্বজগৎ তাঁর (ঈশ্বরের) অমৃতময় আনন্দ, তাঁর প্রেম।

ঔপনিষদিক আনন্দবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যেই তিনি ব্রহ্মের আনন্দময়, প্রেমময় সত্তাকে অনুভব করেছেন। 'জগতে আনন্দযজ্ঞে' কবির নিমন্ত্রণ। তাঁর এই আনন্দের স্বরপটি জানা প্রয়োজন। কবির অনুভূত আনন্দ অনাবিল আনন্দ নয়, সুখ-দুঃখ মেশানো বিমিশ্র আনন্দ। 'আত্মপরিচয়'-এর 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে আনন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মানবজীবনে স্রষ্টার তিনটি পর্যায়—তিনটি স্বরূপ—

শান্তম্-শিবম্-অদ্বৈতম্। শান্তম্—নিরবচ্ছিন্ন সুখের পর্যায় (বাল্য ও কৈশোর), শিবম্—জীবনসংগ্রামের পর্যায় (অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ভরা যৌবন যেখানে আছে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' কণ্ঠ (৬।২), দুঃখ, ভয়, বিপদ, বাধাকে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ায় অদম্য প্রয়াস এবং অদ্বৈতম্—আনন্দম্—আনন্দের পর্যায়। আনন্দের পর্যায়ে জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, শোক ইত্যাদি সবকিছুতেই আনন্দ। আনন্দকে লাভ করতে হলে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমুখর শিবমের পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। তাই আনন্দও ব্যথা-বেদনা-মুখর আনন্দ। আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন করা আনন্দ নয় দুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈতরূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তোলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।"

এ ধরনের চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপনিষদের ভাবরসে কবিমন লালিত হলেও তাঁর স্বকীয়তার অভাব নেই। তাঁর আনন্দবাদী চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় 'খেয়া'র 'আগমন', 'দান' ইত্যাদি কবিতায়, 'গীতালি'র 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে ভয়'... প্রভৃতি গানে এবং 'শারদোৎসব', 'মুকুট', 'অচলায়তন', 'রাজা', 'ডাকঘর' ও 'ফাল্গুনী' নাটকে। 'ধর্ম' প্রবন্ধমালার অন্তর্গত 'দুঃখ' প্রবন্ধে তিনি ওই একই কথা আরও সুন্দর করে বলেছেন—"জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে; কিন্তু তাহা যেন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ; তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে। তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ, দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে, তাহা আনন্দ। দুঃখও অনন্দরূপমমৃত্।" রবীন্দ্রনাথের 'রোগশয্যায়'-এর একটি কবিতায় আনন্দের অনুভূতি বাণীমূর্তি লাভ করেছে—

"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।"

রবীন্দ্র-আনন্দবাদে আরও একটি মৌলিকতার দিক আছে। মায়াবাদীর মতো নেতিবাচক মন নিয়ে (এই মতে এই সংসার মায়া বা মোহ মাত্র, সত্য নয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা (প্রবক্তা—আচার্য শঙ্কর)। রবীন্দ্রনাথ সংসারকে ত্যাগ করে আনন্দ লাভের কথা বলেন নি। কবিধর্মের পক্ষে মায়াবাদ গ্রাহ্য নয়, কারণ দৃশ্যজগতের সঙ্গে মিলনের সূত্রেই কবিত্বের স্ফূরণ। যোগদর্শনের যোগধর্মের প্রতি (যোগাশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ) কবির প্রবল অনীহা

ছিল—'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' মুক্তির স্বাদ তিনি পেতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।' তবে কবির ধর্ম কি?—

"যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে গানে,
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

—এমন কথা কখনো উপনিষদের ঋষিদের নয়, সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা। বিশ্বমানবের সঙ্গে প্রেমের মিলনেই বিশ্বদেবতার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ মিলন। কবিকণ্ঠে তাই ঝংকৃত হয়—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।" (গীতাঞ্জলি)

অন্ধকারের এক কালো আস্তরণ সত্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশকে ঢেকে রাখে। সত্যকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। তাই আনন্দও পাই না। সেজন্য উপনিষদের ঋষি সকল সংশয়বুদ্ধি ত্যাগ করে বললেন, "আমাকে অসত্য থেকে সত্য, অন্ধকার থেকে আলোয় এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে চল।" এই প্রার্থনা মন্ত্র পরবর্তী সাহিত্যে, —পুরাণে, মহাভারতে বার বার উচ্চারিত হয়েছে।

১৩০৬ সালে 'কল্পনা' কাব্যের 'রাত্রি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ 'বেদাহমেতং' মন্ত্রের উপর ভিত্তি করে লিখেছিলেন। রাত্রি অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে থেকেই জ্যোতির্ময় সত্তার অস্তিত্ব অনুভব সম্ভব। কারণ যিনি 'আদিত্যবর্ণ' তিনি আছেন 'তমস পরস্তা' —অন্ধকারের ওপারে। সুতরাং, অন্ধকার থেকে আলোয়, দুঃখ থেকে আনন্দে, অসত্য থেকে সত্যে যাওয়া সম্ভব। সেজন্য কবি অন্ধকারকে (দুঃখ) আশ্রয় করে তাঁর স্তব করেছেন—

"মোরে কর সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা।
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।..."

'বেদাহমেতং' শীর্ষক মন্ত্রটি বোধহয় কবির খুব প্রিয় ছিল। কারণ তিনি মন্ত্রটির রূপান্তর সাধন করেছিলেন—

"শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধ্যামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।"

'ধর্ম' প্রবন্ধের অন্তর্গত 'ধর্মের সরল আদর্শ', 'প্রার্থনা', 'ধর্মপ্রচার', 'উৎসবের দিন' প্রমুখ প্রবন্ধে শান্তিনিকেতন উপদেশমালার 'প্রার্থনা', 'বিকারশঙ্কা', 'প্রার্থনার সত্য', 'নবযুগের উৎসব', 'একটি মন্ত্র' প্রভৃতি উপদেশমালায়;

'ঔপনিষদিক ব্রহ্ম'—শীর্ষক প্রবন্ধে এবং 'নৈবেদ্য'র 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে' নামক কবিতায় (দ্রঃ নৈবেদ্য ৩০—পঃ বঃ সঃ সং) জ্যোতির্ময় সত্যপুরুষকে জানার কথা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

৪০৪.২.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'রবীন্দ্রদর্শন উপনিষদ-দর্শনের রসভাষ্য হলেও মৌলিক অনুভবে সমুজ্জ্বল' —মন্তব্যটি নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

২। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় উপনিষদের আনন্দবাদ কীভাবে সর্বেশ্বরবাদে উত্তীর্ণ হয়েছে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

ডিএসই-৪০৪

বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক ৬

উপনিষদের অহং ও আত্মা সম্পর্কিত রবীন্দ্রচেতনা

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.২.৬.১ : উপনিষদের অহং ও আত্মা সম্পর্কিত রবীন্দ্রচেতনা

৪০৪.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৪.২.৬.১ : উপনিষদের অহং ও আত্মা সম্পর্কিত রবীন্দ্রচেতনা

'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 'যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ'। সত্যকারের আনন্দের স্বরূপ কি তা আমরা জানতে পারি এই সংবাদ থেকে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও ক্যাত্যায়ণীকে ডেকে তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দুজনের মধ্যে ভাগ করে নিতে বললেন। মৈত্রেয়ী স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, —'এসব বিত্ত দিয়ে কি আমি অমৃতত্ত্বলাভ করতে পারবো? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, 'না, এই দিয়ে তুমি সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করবে।' প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্' (বৃহদারণ্যক ২।৪।৩)। —"যা দিয়ে আমি অমৃতকে—অনন্দকে পাব না, তাই দিয়ে আমি কি করবো?"

রবীন্দ্রসাহিত্যেও ওইরূপ অমৃততত্ত্বের কথা, দুর্লভ কথা, প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে নানাভাবে ছড়িয়ে আক্ষ্ম ছে। 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার 'প্রার্থনা' শীর্ষক উপদেশে অমৃততত্ত্ব-ভাবনার প্রকাশ দেখি। উপনিষদের অমৃততত্ত্ব-জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রমানসকে কতখানি অভিভূত করেছিল তার পরিচয় এখানে পাই—"মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না।" —রবীন্দ্রজীবনে এ এক বিশেষ প্রত্যয়। আমরা যথার্থই কি চাই ও চাইনে ব্রহ্মবাদিনী নারী মৈত্রেয়ীর মুখ থেকে জানতে পেরেছি। কবিও তাই প্রার্থনা করেছেন, "হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এসো সংসারের উপকরণ পীড়িতের মধ্যে তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুরকণ্ঠে আমার হৃদয় উচ্চারণ করে যাও। নিত্যকাল যে কেমন

করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।" কবির এই প্রার্থনা থেকে মনে হয় তিনি যেন নিত্যকালের ভারতবর্ষের বাণীবাহক। যেন তিনি ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর পাশে এসে দংাড়িয়েছেন। তাঁর কাব্যভাবনা ও অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা এক হয়ে গেছে।

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'অমৃত' কবিতায় মৈত্রেয়ীর দৃপ্ত বাণীটি নতুন করে বিঘোষিত হয়েছে। এখানে অমৃত হল ভালোবাসা—'ভালোবাসাই সেই অমৃত, উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ।' মৈত্রেয়ী ভোগ, উপকরণ অপেক্ষা অমৃত ভালোবাসা-প্রেম-আনন্দকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'অমৃত' কবিতাটিতে কবি দেখিয়েছেন, তাঁর কল্পিত প্রেমময়ী নায়িকা 'আমিয়া'কে নায়ক 'মহীভূষণ' উপকরণের দূর্গ থেকে উদ্ধার করে মৈত্রেয়ীর বাণীকে সার্থক করে তুলেছে।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদে আছে ভূমার কথা (ছান্দোগ্য ৭।২৩ অধ্যায়)। 'নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে'—এই ভূমা-তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করে মহাগ্রন্থপারগ নারদ আত্মবিদ্যা লাভের জন্য এসেছেন ঋষি সনৎকুমারের কাছে। নারদ বললেন, "প্রভু আমি অনেক মন্ত্র, অনেক গ্রন্থ আবৃত্তি করেছি, পড়েছি কিন্তু আত্মবিদ্যা আমার আয়ত্ত হয়নি। তাই আমি শোকগ্রস্ত" —'ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ, ... সোহহং ভগব শোচামি' (ছান্দোগ্য ৭।৩) —'আপনি আমায় উপদিষ্ট করুন। সনৎকুমারের উপদেশ দিলেন, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্" (ছান্দোগ্য ৭।২৩।১)। —ভূমা-ই (আনন্দই) সুখ, অল্পে (অন্য কিছুতে) সুখ নেই, সুতরাং 'ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (ছান্দোগ্য ৭।২৩।১)। 'ভূমাই তোমার উপলব্ধির বিষয় হওয়া উচিত।' উপনিষদের চরম কথা এই ভূমার কথা। খণ্ডবিচ্ছিন্নের মধ্যে, সীমার মধ্যে সুখ নেই—'ভূমৈব সুখম্।"

'নৈবেদ্য'র একটি কবিতায় অল্প-তুষ্ট কবির আর্তি এবং অনন্তের কাছে আত্মনিবেদন ও জিজ্ঞাসার ভাবটি ঋষিকবির 'নাল্পে সুখমস্তি' কথাটিরই প্রতিধ্বনি। প্রথমে—

"অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়—
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে
প্রাণ করে হায়-হায়।"

পরে— "তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণুপরমাণু—
আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে না কি তব পায়?
অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।" 'নৈবেদ্য' ১৭

ভূমাতত্ত্বের কথা রবীন্দ্রজীবনে নানা অভিভাষণে সার্থক হয়েছে। তাঁর প্রায় সমস্ত ধর্মমূলক প্রবন্ধে, 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্য'-এর গানে, 'আত্ম-পরিচয়' এবং 'শারদোৎসব' থেকে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত নাটক নাটিকায় নানাভাবে এই ভূমানন্দের কথা বলা হয়েছে। 'মানুষের ধর্ম'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি এই ভূমানন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভূমাকে আহারে বিহারে, আচারে বিচারে, ভোগে নৈবেদ্যে, মন্ত্রে তন্ত্রে লাভ করা যায় না। তাকে পেতে হয় 'বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে।' এর জন্য সাধনা প্রয়োজন। স্তবে অনুষ্ঠানে নয়, আপনার চিন্তায় কর্মে সেই পরম মানবকে উপলব্ধির সাধনা এক কঠিনতম সাধনা। কেমনা 'নায়মাত্মা বলহীনের লভ্যঃ

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।' রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তারা সত্যকে অন্তরে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূ র করতে হয়, তবেই অহংকারকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌঁছোতে পারি। আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, তাকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে। —বাউল সেই কথাই বলেছে তার গানে —'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ। 'চিত্রা' কাব্যের 'এবারও ফিরাও মোরে' কবিতায় '... মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা, মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।' ... ইত্যাদি অংশেও সংসারের সুখে-দুঃখে, কর্মের মধ্য দিয়ে ভূমাকেই লাভের কথা বলা হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ভূমাতত্ত্বের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক মননশীলতার ছাপ পড়েছে। তাঁর মতে, ভূমাকে লাভ করার জন্য লোকালয় ত্যাগ করে গিরি-গহ্বরে যাবার প্রয়োজন নেই। ভূমার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তা মানবিক সাধনা, অর্থাৎ মন যাকে স্বীকার করে তাই—"আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সেকথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব হৃদয়, আমার কল্পনা মানব কল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়তে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্য প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্যকিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।" সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভূমা বা আনন্দ আছে মানুষের মনে। মানবীয় আধারেই এই ভূমানন্দের আস্বাদন সম্ভব হয়।

উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে আত্মস্থ ও স্বীকৃত করে নিয়ে এইভাবে নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও ভাষ্যরচনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা পরিস্ফুট হয়েছে।

৪০৪.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। দেবতা নয়, শেষ পর্যন্ত মানবধর্ম রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে মূল প্রসঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। —মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

ডিএসই-৪০৪

বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক ৭

উপনিষদের ঈশাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রবীক্ষা

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.২.৭.১ : উপনিষদের ঈশাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রবীক্ষা

৪০৪.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৪.২.৭.১ : উপনিষদের ঈশাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রবীক্ষা

ঈশোপনিষদের একটি মন্ত্র তত্ত্ব ও সাধনার দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঋষি 'পূষণ' কে—জগৎপোষক সূর্যকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে"। (ঈশ ১৫)—"স্বর্ণময় পাত্রের দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের মুখ আচ্ছন্ন। হে পূষণ্, সরিয়ে নাও তোমার কুহেলির আচ্ছাদন। আমি সত্যসন্ধ—সত্যকে উপলব্ধি করতে চাই।" মানুষের তাই চিরন্তন ক্রন্দন—অপাবৃণু—সরিয়ে নাও। এরপর সত্যের আবরণমুক্ত কল্যাণময় রূপ দেখার বাসনা জেগেছে ঋষির মনে, বলেছেন, "পূর্বণ্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজ্যপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহঃ তেজঃ। যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"—শুধু তাই নয়, তোমার কল্যাণময় রূপ দেখে আমিও তোমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছি, তুমি আর আমি একাকার হয়ে গেছি—'যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।' রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্রটির অনুবাদ করেছেন—'দেখি তোমার মাঝারে যে পুরুষ সে এক।' আচার্য শংকর 'সোহহং' তত্ত্বের উপর এক বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ শংকরভাষ্যকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি 'সোহহং তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।' সোহহং শব্দের মর্মার্থ হল 'আমি তাঁর সঙ্গে এক, যিনি আমার চেয়ে বড়ো।' এই সরল অর্থ ছেড়ে যাঁরা ভ্রান্তপথে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাদের বিদ্রূপ করেছেন।

প্রত্যেক মানুষের অভিব্যক্তি দুই প্রকার। একটি তার অহং অপরটি তার আত্মা। অহং 'আপনাতে আপনি সীমাবদ্ধ', আত্মা 'সর্বত্র পরিব্যাপ্ত'। অহং সবসময় আত্মার পিছে পিছে আছে। ব্যক্তি অহং-এর ঢাকাটা সরে গেলেই আত্মা বেরিয়ে আসে। অহং—সংকীর্ণ আমি, খণ্ড আমি, সীমাবদ্ধ আমি; আত্মা—বৃহৎ আমি, অসীম—অনন্ত আমি, অখণ্ড আমি। এই দ্বিতীয় আমি বা আত্মা অমৃত, শাশ্বত। অহং সবসময় চেষ্টা করেছে আত্মাকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে

আবদ্ধ রাখতে। আর আত্মা চাইছে অহং-এর বেড়াজাল ছিন্ন করে বাইরে বেরিয়ে আসতে, উপনিষদে অন্তর্নিহিত এই দ্বৈতসত্তা—অহং ও আত্মার কথা বলা হয়েছে। মানবজীবনে অহরহ এই অহং ও আত্মার দ্বৈতলীলা চলছে।

মুণ্ডকোপনিষদে অহং ও আত্মার নামান্তরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিসস্বজাতে। তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশন্নন্যোহভিচাকশীতি।" —"দুই পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পাখী একই গাছ আশ্রয় করে আছেন। তাঁদের একজন মিষ্টফল আহার করেন, আর একজন অনশনে থেকে কেবল দর্শন করেন।" এখানে পাখী দুটির মধ্যে যিনি স্বাদু ফল আহার করেন তিনি জীবাত্মার প্রতীক, আর যিনি অনশনে থেকে কেবল দর্শন করেন তিনি পরমাত্মার প্রতীক। প্রতীকরূপ ব্যবহার করে জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই বৈষম্য নির্ণয়ে ঋষিকবির নৈপুণ্যের পরিচয় আছে।

'সোনারতরী'র দুই পাখি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথও অহং ও আত্মার প্রতীক দুটির বৈষম্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। পাখী দুটির মধ্যে একটি—বন্ধন-তুষ্ট খাঁচার পাখী—সংসারের প্রাত্যহিকতাবদ্ধ সংকীর্ণ ব্যক্তি—জীবাত্মা বা অহং, আর অন্যটি বনের পাখি—যে মুক্তবন্ধন—পরমাত্মা। কবির ভাষায় দুই পাখী—

"খাঁচার পাখি ছিল, সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'
বনের পাখি বলে, 'না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব'
... ...
এমনি দুই পাখি, দোঁহারে ভালোবাসে,
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মারে পাখা
কাতরে কহে, 'কাছে আয়'।
বনের পাখি বলে, 'না

কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার।' "

'জাপান-যাত্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুণ্ডকোপনিষদের পূর্বোক্ত শ্লোকের আলোকে মানুষের নিজের মধ্যেই দুই পাখির অস্তিত্ব অনুভব করে লিখেছেন—"উপনিষদে লিখছে, এক ডালে দুই পাখি আছে, তার মধ্যে এক পাখি খায় আর এক পাখি দেখে। যে পাখি দেখছে তার আনন্দ বড়ো আনন্দ; কেননা, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখি আছে।

রবীন্দ্রজীবনে আমরা অহং ও আত্মার দ্বৈতলীলার পরিচয় পেয়েছি। অহংকে তিনি বলেছেন 'ছোটো আমি', আত্মাকে বলেছেন, 'বড়ো আমি'। ছোটো আমির সীমার আবরণ খসে গেলে মানুষের মধ্যে বড়ো আমির প্রকাশ ঘটে। তখন ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তি-অনুভূতি বিশ্বসত্তা ও বিশ্বানুভূতি লাভ করে—ব্যক্তির কল্যাণও স্বার্থচিন্তা অপেক্ষা সমগ্র বিশ্বমানবের মঙ্গল-এষণা বড়ো করে দেখা দেয়; মানুষ হয় বিশ্বভাবনার ভাবুক, বিশ্বপ্রেমিক। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত 'নদী ও কূল', 'আত্মার প্রকাশ', 'স্বভাবকে লাভ', 'অহং' ইত্যাদি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ অহং ও আত্মার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ক্ষুদ্র অহং-এর ঊর্ধ্বে উঠে বৃহৎ আত্মার মুক্ত অঙ্গনে যেতে পারলেই সাধক আত্মার আনন্দময় স্বরূপটি আস্বাদন করতে পারে। এই কথাটি বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ওই যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে কৃপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মতলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয়; কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর। আত্মা যে 'ন জায়তে ন ম্রিয়তে' না জন্মায়, না মরে। কিন্তু ওই অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে; কিছু না পারে তো অন্ততঃ তার ওই নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।" অহং-এর স্বভাব হল নিজের দিকে টানা, আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরে দিকে দেওয়া। সুতরাং আত্মার বিকাশের জন্য অহং-এর অতিক্রম অত্যাবশক।

লক্ষণীয়, অহং ও আত্মার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ আত্মাকে উচ্চাসন দিলেও অহংকে কোথায় বিসর্জন দেন নি, বরং অহংকে অবদমিত ও সংযত করেই আত্মার বিকাশের কথা বলেছেন। 'অহং-এর স্বভাব হল সঞ্চয় করা। সঞ্চিত সবকিছু 'আমার' এই অমত্ববোধের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সব কিছুকে অহং আবদ্ধ রাখে। 'অহং শুধু নেয়, দেয় না কিছুই।' কিন্তু, "অহং-এর এই নেবার ধর্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে কেবল মাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যা না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। থখন আমার আনন্দময় স্বরূপ কোথায়? তখন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।" দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম, সৃষ্টির ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আত্মার যথার্থ স্বরূপই হল আনন্দময় স্বরূপ। —সেই স্বরূপে সে সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়, সে কাঙাল নয়। অহং-এর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন দেবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে। তাই অহং-এর এই সঞ্চয়কে আত্মা গ্রহণ করে না—তাকে সৃষ্টির মধ্যে, প্রকাশের মধ্যে দান করে বিসর্জন দেয়। এই দানের দ্বারাই তার যথার্থ প্রকাশ। কেননা, "ঈশ্বরের আনন্দস্বরূপ ও অমৃতরূপ বিসর্জনের দ্বারাই প্রকাশিত। সেইজন্য অহং তখনই আত্মার যথার্থ প্রকাশ। কেননা, সেইজন্য অহং তখনই আত্মার যথার্থ প্রকাশ হয় যখন আত্মা তাকে উৎসর্গ করে দেয়, আত্মা তাকে নিজেই গ্রহণ না করে।" কবির অমর আত্মার সঙ্গে যে মরণধর্মী অহংটা 'আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো' নিয়তই লেগে রযেছে তাকে বর্জন করাই কবির পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু

আগেই বলেছি, 'অহং' ও 'আত্মা'—দুয়ের সমন্বয়েই লীলা। সীমার মাঝেই অসীমের আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ—কবির কথায়—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।' সীমা—অহং, অসীম—আত্মা। রবীন্দ্রজীবন সাধনা এই সীমা-অসীমের লীলা প্রকাশে পূর্ণ।

উপনিষদের মতো রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছেন, 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। 'স্বর্ণপাত্রের মুখের ওই ঢাকনাটি অনাবৃত করলেই সত্যের যথার্থ স্বরূপ অনুভবগোচর হবে। এখানে হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ বা ঢাকনাটি অহং-এর প্রতীক, আর এই অহংকে ত্যাগ করলেই আত্মার বিকাশ। উপনিষদ তাই বলেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' —ত্যাগের দ্বারা ভোগ হয়। এই ত্যাগ—রবীন্দ্রনাথের মতে অহংকে ত্যাগ। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গতেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের স্বর্ণপাত্রের এই ঢাকনাটি উন্মোচিত হয়েছিল, 'অহং'-এর সীমা থেকে অনন্ত বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে কবি মুক্তিলাভ করেছিল। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের সেই ইতিহাস কবি 'জীবস্মৃতি'তে লিখে রেখেছেন। অহং ও আত্মার এই অনুভূতির উল্লেখ কবি যেমন ধর্মমূলক প্রবন্ধগুলিতে করেছেন (যেমন 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'মানুষের ধর্ম', 'আত্মপরিচয়' প্রভৃতি প্রবন্ধমালায়), কাব্যেও তেমনি তাঁর অনুভূতিই বিভিন্ন কবিতায় তত্ত্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে। 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে শুরু করে 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি', 'খেয়া', 'নৈবেদ্য', 'বলাকা', 'শ্যামলী', 'শেষসপ্তক'—ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত শেষদিকে 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থেও এই তত্ত্বকথা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম বয়সের কাব্যগুলিতে কোথাও স্ফুটভাবে; কোথাও অস্ফুটভাবে এই অহং ও আত্মার দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। প্রথম বয়সের কাব্যগুলিতে কোথাও স্ফুটভাবে; কোথাও অস্ফুটভাবে এই অহং ও আত্মার দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। 'মানুষের ধর্মে', 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তাতে 'প্রভাতসঙ্গীত' রচনাকালে কবি আত্মার এই দ্বৈতলীলার কথাটাই বেশি করে দেখা দিয়েছে। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর 'আহ্বান সংঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমল'-এর 'স্বপ্নরুদ্ধ', 'শ্যামলী'র 'কালরাত্রে', 'পত্রপুট'-এর ৬, ৭, ১০ সংখ্যক কবিতা, 'রোগশয্যার'-এর ২২, ৩৬ সংখ্যক কবিতা, 'আরোগ্য'-এর ৫ সংখ্যক কবিতা, 'রোগশয্যার'-এর ২২, ৩৬ সংখ্যক কবিতা, 'আরোগ্য'-এর ৫ সংখ্যক কবিতা, 'প্রান্তিক'-এর ৯,১২ সংখ্যক কবিতায়, 'জন্মদিন'-এর ২৩, ২৫ সংখ্যক কবিতায় এবং 'পূরবী'র 'সাবিত্রী' কবিতাটিতে অহং ও আত্মার কথা বলা হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি'র 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে' গানের মধ্যে 'অহং' থেকে মুক্তির কথা আছে—'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে' ('গীতাঞ্জলি' ১)। 'গীতাঞ্জলি'র ৪১ সংখ্যক গানে অহংকে মলিন বস্ত্র হিসেবে কল্পনা করে সেই অহংকার বিসর্জন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে—'এই মনিলবস্ত্র ছাড়তে হবে গো এইবার—আমার এই মলিন অহংকার।' 'গীতাঞ্জলি'র ১৪৫ সংখ্যক গান—'জড়ানো আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই' ... ইত্যাদির মধ্যে অহং থেকে মুক্তির কথা আছে। অহং ও আত্মা, সীমা ও অসীমের বিরোধ রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির স্থিতি ও পুরুষের মুক্তভাবের কথা আছে। এই মুক্তভাবের বেদনা রবীন্দ্রকাব্যে অপূর্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'কচ ও দেবযানী' এবং 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়।

ঈশোপনিষদে আর একটি সাধনার কথা বলা হয়েছে—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্। (ঈশ ১)। —'বিশ্বজগতের যাহা কিছু চলিতেছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না' (রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ, দ্রঃ 'ধর্ম' প্রবন্ধ) মন্ত্রটি কবির কাছে প্রিয় ছিল। সর্বভূতে ঈশ্বরের ছায়া এবং তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত বিষয়কে ভোগের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের যে উপাসনা—রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তাই সত্যকারের

সাধনা। যে বিশ্বজাগতিক শক্তিকে উপনিষদে 'ঈশা' বলা হয়েছে—তিনি এই জগতের 'বাহকশক্তি', 'কল্যাণশক্তি'। এই কল্যাণশক্তিকে জাগ্রত করাই তপস্যা।

ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে—"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে" (ঈশ ২)। এই মন্ত্রে আবার কর্মের জন্য কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর আক্ষ্ম মাদের শতবর্ষ পরমায়ু দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন? —ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ করবার জন্য এবং কর্মের মধ্য দিয়ে, প্রেমের মধ্য দিয়ে মানুষকে ভালোবাসার জন্য। অর্থাৎ মানবসেবা ও মানবকল্যাণের জন্য। কর্মে ও প্রেমে বিশ্বমানবের কল্যাণকামনা—সে তো মনুষ্যত্বেরই সাধনা। এই সহজ কথাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Religion of Man' বক্তৃতার মধ্যে পরিস্কার করে বলেছেন। লোক কল্যাণকর কর্মে, স্বার্থত্যাগে ও আত্মবিসর্জনে নিজের অন্তর্নিহিত পূর্ণ সত্তার জাগরণই তো মানুষের ধর্ম। ঈশা-আদর্শের পরিকল্পনায় উপনিষদ আমাদের এই মহতী শিক্ষাই দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Religion of Man'-এ তাই লিখলেন—

'The Isha of our Uponishad, the super soul, which permeates all moving things, is the God of this human universe whose mind we share in all our true knowledge, love and service and whom to reveal in ourselves through renuciation of self is the highest end of life."

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতার সেই 'ভালোবাসা, প্রেমে হও বলী, চেয়ো না তাহারে। আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের'—ইত্যাদি অংশের মূল কথাটি হল মানবাত্মার সেবা ত্যাগে ও প্রেমে। তাই 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ ধনম্' —ঋষিকবির এই উপদেশ। রবীন্দ্রনাথও বললেন —"মানব সংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক—কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা —সেই উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।"

'পরম সত্তার মানুষের নিকট সাক্ষাৎ প্রকাশ বিশ্বমানের মধ্যে।' আর মানুষের ধর্ম হল বিশ্বমানবে প্রেম ও বিশ্বজনীন কর্মানুষ্ঠান। এর জন্য নিজেকে বিশ্বে প্রকাশিত করা দরকার। আমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'আবিরাবির্ম এবি —'তে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও।' 'আমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ সার্থক হয়ে উঠুক কর্মে ও প্রেমে।' —মর্তের ধুনিমালিন্যের মাঝে মানুষ এই সত্য সঞ্জাত হলেই মানবজীবন সার্থক, নচেৎ 'মহতী বিনষ্টিঃ।' কেনোপনিষদের ঋষি তাই বললেন, 'যহচেদ্ বেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদীহান্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষঞ্চ বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাপ্রোকদমৃতা ভবন্তি' (কেন ৩।৫)। অতএব 'ইহলোকেই ঈশ্বরকে জানো এবং সেই জানার মধ্য দিয়েই নিজেরা সেই 'আবিঃ'র মতো নিত্য প্রকট হও। এতেই কল্যাণ হবে।' —উপনিষদের এই আদেশ। উপনিষদ আরও বলেছেন, 'যস্তু সর্বাণ ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে' (ঈশ ৬)। —"যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে যে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত।" পাশ্চাত্যজগতের বিজ্ঞানদম্ভী মদমত্ততা ও ভেদজ্ঞানের সামনে প্রাচ্যজগতের প্রকাশের এই আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (দ্রঃ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ)। এই জানা ও প্রকাশের ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথও বলেছেন একটি গানে—'আমি যে সব নিতে চাইরে/আপনাকে ভাই মেলবো যে রাইরে।' সমস্ত উপনিষদের পাতায় পাতায় এই একই কল্যাণদর্শ, একই অভয়বাণী বারবার ধ্বনিত হয়েছে।

মানবধর্মের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে দেখতে হবে, জানতে হবে। 'Religion of Man'-এ রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট করে লিখলেন—

'My Religion is the reconciliation of the super personal man, the universal human spirit in my own individual being.'

'মানুষের ধর্ম'-এর ভূমিকায় কবি একই কথা আরও প্রাঞ্জল করে বলেছেন—"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তার প্রেমে সহজে জীহবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।... সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে, 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা।' সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন—স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'

৪০৪.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। রবীন্দ্রজীবনে ও ভাবনায় ঔপনিষদিক দর্শন কীভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, আলোচনা করো।

২। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মৃত্যু কীভাবে ধরা দিয়েছিল, তাঁর জীবন ও কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে বুঝিয়ে দাও।

ডিএসই-৪০৪

বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক ৮

উপনিষদের ঐক্যবোধ-বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয় : রবীন্দ্রনাথ

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.২.৮.১ : উপনিষদের ঐক্যবোধ-বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয় : রবীন্দ্রনাথ

৪০৪.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৪.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪০৪.২.৮.১ : উপনিষদের ঐক্যবোধ-বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয় : রবীন্দ্রনাথ

ঈশোপনিষদের আর একটি কথা ঐক্যের কথা, সমন্বয়ের কথা। কিসের সমন্বয়?—বিদ্যা এবং অবিদ্যার সমন্বয়, জ্ঞান এবং কর্মের সমন্বয়। বিদ্যা অর্থাৎ পরাবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা। আর অবিদ্যা-জড় বিদ্যা, ভৌতিক বিদ্যা। অবিদ্যা বিজ্ঞান, আর বিদ্যা-পরাজ্ঞান বা প্রজ্ঞান। অবিদ্যা—কর্ম, বিদ্যা-মোক্ষ। অবিদ্যা জাগতিক কামনা-বাসনার উপকরণ জোগায়, আর বিদ্যা মুক্তির প্রেরণা দেয়। উপনিষদ তাই বলেন—'যাঁরা মোক্ষাকাঙ্খী তাঁরা বিদ্যার উপাসনা করবেন, আর যাঁরা সংসারী, স্থূল-ভোগাকাঙ্ক্ষী তাঁরা করবেন অবিদ্যার উপাসনা। আর যাঁরা এই দুইয়ের সমন্বয় স্থাপন করতে পারবেন তাঁরা অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অমৃতকে লাভ করবেন—"বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যামৃতমশ্নুতে" (ঈশ ১১)। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই সমন্বয়ের আদর্শ রবীন্দ্রনাথও লাভ করেছিলেন উপনিষদ থেকে। বলেছিলেন—

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" (ভারততীর্থ)

এই মিলনই পূর্ণাঙ্গ মিলন। এই মিলনের নির্দেশ আছে উপনিষদে। 'শিক্ষার মিলনে' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"পূর্বপশ্চিমের মিলন মন্ত্র উপনিষদ দিয়ে গেছেন। বলেছেন,—বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যু তীর্ত্বা বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্যমিদং সর্বং—এইখানে

তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা ঋষি বলেছেন। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্য-পীড়িত, সে নির্জীব, আর মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, নিরানন্দ।"

রবীন্দ্রসাহিত্যে মানবতাবোধ আর বিশ্বাত্মবোধ বা বিশ্বৈকবোধ—একই অদ্বয়বোধ। জীবনের এক একটি ক্ষণিত মুহূর্তের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা অখণ্ড মানবজীবনকে নিয়ে এই অদ্বৈতবোধ। বিবর্তনের পথে যুগ-যুগান্তর ও জন্ম-জন্মান্তর ধরে প্রতিটি মুহূর্তের যোগে অগ্রসর মানবজীবন এবং যুগে যুগে রূপান্তরিত মানবিক বৃত্তিগুলির সমন্বয়ে মানবজীবনের যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তাই মহামানবতার ধারা। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি মানবই সম্পূর্ণ নয়—সমগ্র বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে, নিখিল মানবের অতীত বর্তমান ও অনাগত মিলিয়ে যে জীবনধারা তার সঙ্গে অখণ্ডযোগেই সে পূর্ণ।

'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে বিশ্বসৃষ্টিপ্রবাহের পশ্চাতে 'অক্ষর প্রশাসনের' কথা আছে—'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯ ইত্যাদি)। সেখানে বলা হয়েছে—এই অক্ষয় প্রশাসনে চন্দ্র-সূর্য, দ্যুলোক-ভূলোক, নিমেষসমূহ, মুহূর্তসমূহ, অহোরাত্রসকল, অর্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবৎসরসমূহ বিধৃত হয়ে আছে (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯)। নদী-পর্বতাদি তাঁরই নির্দেশে স্যন্দমান, 'তদ্ বা এতদ্ অক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট-শ্রুতং শোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ ... এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি' (বৃহদারণ্যক ৩।৮।১১)। এই অক্ষর প্রশাসনের কথায় উপনিষদ আরও বলেছেন, "অগ্নি ইহার ভয়ে তাপ দিতেছেন, ইহার ভয়ে সূর্য তাপ দিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু—ইহার ভয়ে ইহারা সকলে ধাবিত হইতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ অক্ষরব্রহ্মের প্রশাসনের মধ্যে ভয়ের দিকটিকে—'মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' দিকটিকে স্বীকার করেও তাঁর আনন্দ ও অমৃতময়প্রকাশরূপকে—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'কে সযত্নে বরণ করেছেন। সৃষ্টিপ্রবাহের অন্তরালে ওই আনন্দস্রোত তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আনন্দময় চেতনা তাঁর কবিধর্মের অনুকূল ছিল বলেই হয়তো কবি ওই অদৃশ্য শক্তিকে অন্তরে এতটা গভীরভাবে গ্রহণ ও অনুভব করতে পেরেছিলেন। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর 'মহাস্বপ্ন' ও 'সোনারতরী'র 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় কবি অক্ষর প্রশাসনের কথা বলেছেন। এ ধারার পরিণতি ঘটেছে 'গীতিমাল্য'-এর 'এই তো তোমার আলোক ধেনু' গানে (গীতিমাল্য ১০৩)। 'নৈবেদ্য'র ভক্তিমূলক কবিতায় অক্ষরব্রহ্মের উল্লেখ করে তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে গভীর যোগ অনুভব করেছেন। অত্যন্ত সচেতনভাবে উপনিষদের সেই 'একেঃ'-এর প্রকাশের পরিচয় আছে 'নৈবেদ্য'র ২৩ ও ২৬ সংখ্যক কবিতায়—

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ

অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।" 'নৈবেদ্য ২৬

এমনি করে জগৎ ও জীবনকে ভালোবেসেই কবি জীবনস্বামীকে ভালোবেসেছেন। তাঁর এই ভালোবাসার প্রকাশ 'নৈবেদ্য'র ১, ৩, ৪, ৬, ৭ ইত্যাদি সংখ্যক এবং 'আকাশপ্রদীপ'-এর 'স্কুল-পালানে' কবিতায়। সকল দ্বন্দ্ব বিভেদ ও সংশয়ের মাঝখানে সত্যের অনড়, অটল আনন্দমূর্তি বিরাজ করেছে, তার বিনাশ নেই—'সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে' (অরোগ্য)। রবীন্দ্রনাথ সেই চিরধ্রুবানন্দের মার্মিক উপাসক ও বাণীবাহক।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ধর্মজীবন একযোগে যুক্ত। গায়ত্রীর ও 'ভুর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্র এবং উপনিষদ আবৃত্তি ও অনুভবের মধ্যে দিয়ে তিনি বিশ্বাত্মবোধ লাভ করেছিলেন—'এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব ও আমার অস্তিত্ব একাত্মক। 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন, তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করেছেন। চৈতন্যও বিশ্ব বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা একধারায় মিলেছে।"

সৃষ্টির সবকিছু একের মধ্যে বিধৃত। বাইরের খণ্ডিত বা নানা অন্তর্নিহিত সেই একেরই বহুধা প্রকাশ। সেই একত্বকে অনুভবের কথা যম বলেছিলেন নচিকেতাকে—"মনসৈবেদমাপ্তব্যম্ নেই নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (কঠ ৪।১১)। প্রজ্ঞানের এই কথা আজ বিজ্ঞানও সমর্থন করেছে। মানুষ দুঃখ-শোকে, ব্যথা-বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু যিনি 'আত্মবিদ্' যিনি আত্মস্বরূপ এককে জেনেছেন, তিনি তো জাগতিক দুঃখ-তাপ থেকে ভয় পাননা। উপনিষদ তাই বলেন—"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি অত্মৈবাভূৎ বিজ্ঞানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" (ঈশ ৭)। সুতরাং সেই এককে জানলেই শোক, মোহ এসব কিছুই থাকবে না। উপনিষদের এই অভয়বাণী রবীন্দ্রজীবন ও বাণীতে সার্থক হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমানবচৈতন্য ও নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি একবৃন্তে বিধৃত। উপনিষদের ঋষি জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন; তার প্রকাশ 'যো দেবোহগ্নৌ যোপ্‌সু' (শ্বেতাশ্বতর ২।১৭) ... মন্ত্রে। আর রবীন্দ্রনাথ নিখিল মানবচৈতন্যের সঙ্গে জন্মান্তর-সঙ্গতি স্থাপন করেছেন। 'ছিন্নপত্রে তিনি লিখেছেন—"এক সময়ে অমি যখন এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য-কিরণে আমার সুদূর-বিস্তৃত, শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর দেশদেশান্তরে জল-স্থল ব্যাপ্ত করে আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেন; তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত, অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত, মুকুলিত, পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।" নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে চেতনার প্রবাহ এবং সেই প্রবাহের সঙ্গে কবিচিত্তের নাড়ীর যোগ স্থাপিত হয়েছে। 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি', 'সোনারতরী'র বিখ্যাত কবিতা স্বর্গ হরইতে বিদায়', 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি', 'চৈতালি'র 'মধ্যাহ্ন' এবং 'পূরবী'র 'মাটির ডাক',—প্রভৃতি কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের

নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে ওঠার পরিচয় পাই। পার্থিবতার মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন নিত্যের জ্যোতির্ময় সত্তাকে। শেষজীবনের কবিতায় তাই তিনি লিখলেন—

"শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরনীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।" 'আরোগ্য'

বিশ্বের অন্তহীন ঐক্যে বিশ্বাস এবং অনুভূতির স্নিগ্ধ আলোকে তাঁকে দর্শন ও কাব্যে তার প্রকাশ—একে 'কবি-অনুভূতি' বা 'অধ্যাত্ম-অনুভূতি' যাই বলা যাক না কেন—এই হল রবীন্দ্রনাথের সহজাত সত্যানুভূতি, উপনিষদের প্রভাব এখানে গৌণ।

রবীন্দ্রনাথের 'জন্মান্তর-সঙ্গতি' পরিকল্পনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। যুগ-যুগান্তর-কল্প-কল্পান্তর ধরে মানবজীবন নিয়ত নিজেকে বিকশিত করে চলেছে। তাই সে যদি একবার চেতনার গভীরে আত্মনিমজ্জন করে তাহলে বিশ্বজননীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করতে পারে, অনুভব করে 'যেন মোর চেতনার আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায় অর্থ তার নাহি জানি, আমি সেই বাণী' —'জন্মদিনে' ৯। 'সোনারতরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় এই অনুভূতির স্পষ্ট পরিচয় আছে। 'রোগশয্যায়'—এর ২৩ সংখ্যক কবিতায় জন্মান্তরে মানবজীবন-বিকাশের অবিচ্ছিন্ন ধারাটি কবির অনুভূতিতে ধরা পড়েছে—

"প্রভাত আলোয় ওই মগ্ন নীলাকাশ
পুরাতন তপস্বীর
ধ্যানের আসন
কল্প আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে,
বুঝিলাম এই জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা
সপ্তরশ্মি সূর্যালোক সম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।"

'নৈবেদ্য'র ২৬ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আপন প্রাণের মধ্যে যুগাযুগান্তের বিরাট স্পন্দন অনুভব করেছেন, —সেকথা পূর্বে বলেছি। দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচেতনা একটি বিশেষ অনুভূতির ভিতর দিয়ে বিশ্বচৈতন্যে মিশে যাচ্ছে। সুতরাং, তাঁর কবিচেতনার দুটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে আছে কবিজীবন তথা মানবজীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোতের ধারা যে ধারায় কবি তাঁর 'ব্যক্তি আমি'কে বিশ্বলীলার মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে এক অখণ্ড ঐক্য স্থাপন করে 'বিশ্ব আমি'তে উন্নীত হয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে চিত্তের অতলে শায়িত 'গুহায়িত' সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'কে অনুভব করেছেন।

কবির ব্যক্তিসত্তা প্রাকৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত এবং পরম একের পরিকল্পনাতে আবর্তিত ও ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে। কবিজীবনে এই ভাবের অভিব্যক্তি বিশেষ অর্থবহ। এই ভাব বাণীমূর্তি লাভ করেছে 'উৎসর্গ-এর কবিতায়—

"তৃণে পুলকিত যে মাটির ধারা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।" —'উৎসর্গ' ১৪

'উৎসর্গ'-এর এই কবিতাটির ৭ম স্তবকটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্তভাবের পরিণতি গভীর অধ্যাত্ম-সুরে—'ধূলা সাথে আমি ধূলি হয়ে রব সে গৌরবের চরণে' ... ইত্যাদি (উৎসর্গ ১৪, ৯ম স্তবক)। এই জাতীয় বোধ কবির নিজস্ব বোধ, এমন আত্মসমর্পণের ভাব উপনিষদে নেই।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদের জাবাল-সত্যকামের কাহিনী থেকে জানা যায়, গৌতমশিষ্য সত্যকাম ব্রহ্মতত্ত্ব জেনেছিলেন মনুষ্যেতরদের কাছ থেকে, প্রকৃতির কাছ থেকে। অনুভূতির আলোকে প্রকৃতির সঙ্গে যোগে সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়—'মানুষের ধর্মে' এই কথাটা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ —"আমার ধর্মানুভূতির প্রথম স্তর দেখা দিয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ উদ্বোধে।" রবীন্দ্রমানসের এই অনুভবকে সমালোচক 'প্রকৃতি রহস্যবাদ' (Nature Mysticism) আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই মৌলিক প্রকৃতিচেতনা বিপুল বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি মৌলিকতা তাঁর সাধনার ধারায়। ঔপনিষদিক সাধনায় জীবাত্মকে পরমাত্মায় লীন করে দেখার কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ এর উপরেও নতুন কিছু যোগ করলেন। তিনি বললেন, শুধু জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করে দিলেই হল না, পরমাত্মাকেও জীবাত্মার অঙ্গনে নামিয়ে আনতে হবে। অনন্তকে সান্তের মধ্যে এবং সান্তকে অনন্তের মধ্যে মিশিয়ে মিলিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ সেই 'সীমার মাঝে অসীমের' লীলার কথা। সীমাকে অসীমে এবং অসীমকে সীমায়, রূপকে ভাবে এবং ভাবকে রূপের মধ্যে ছাড়া দিতে পারলেই মুক্তি ও আনন্দ মিলবে। আর এ মুক্তি বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের নিবিড় প্রেমে সার্থক। এই মৌলিক কবিভাবনার কথা অভিব্যক্ত হয়েছে 'সোনারতরী'র 'দেউল', 'নৈবেদ্য'র 'ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, 'ওরে আত্মভোলা', 'চৈতালি'র 'যার খুশি রুদ্ধ চক্ষে করো বসি ধ্যান', 'গীতালি'র বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি' প্রভৃতি শীর্ষক গান ও কবিতায়। এই কবিসাধনার কথা বলতে গিয়েই কবি লিখেছেন—

"আজ যে আমি বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।"

রবীন্দ্রনাথের আর একটি অভিনবত্ব ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক নির্ধারণে। সর্বেশ্বরবাদের আলোচনায় এই বিষয়টির উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে প্রাত্যহিক নানা মানবীয় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পেতে চেয়েছিলেন। 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্য'-এর গানে এবং ধর্মমূলক রচনার সর্বত্র এই সম্বন্ধে আলোচনা ছড়িয়ে আছে। বৈদিক ঋষিকবির মতো ঈশ্বরকে 'পিতা নোহসি' —'তুমি আমাদের পিতা' বলেই ক্ষান্ত হননি; শাক্তবৈষ্ণব কবির মতো তাকে সখা, বন্ধু, প্রাণেশ্বর, ভুবনেশ্বর, জীবনস্বামী, বিশ্বজননী, মা, প্রিয়া, প্রেয়সী প্রভৃতি বিচিত্র সম্বোধনে তাঁর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এই সম্পর্কের মধ্যে মিলন-বিরহের বিচিত্র লীলা রবীন্দ্রসাহিত্যকে এক বিশেষ মাধুর্যে ভরে তুলেছে।

রবীন্দ্রকাব্যে এই জাতীয় চিন্তাধারাকে সমালোচক 'রবীন্দ্রভাবনায় নর-নারায়ণ' আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যে এই 'নর-নারায়ণ' চিন্তার প্রকাশ 'গীতাঞ্জলি'র ১০৬, ৯৪, ১০৭, ১১৯, ১২০, ১২১ ইত্যাদি সংখ্যক গানে, দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে লেখা চিঠিতে (১৯২১, যার মূলকথা God manifest in man), 'আত্মপরিচয়'-এর ৫ম অধ্যায়ে, 'মানুষের ধর্ম'-এর ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে 'মানুষের ধর্ম' এর সংযোজন অধ্যায়ের 'মানবসত্য' নিবন্ধে (নৈবেদ্য ৩০) এবং 'পত্রপুট'-এর কবিতায়। 'পত্রপুট'-এর ১৫ সংখ্যক কবিতায় এই সত্যটি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে—

"আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"

জীবনের শেষ পর্যন্ত অখণ্ড মানবতার অনুধ্যান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের 'পরামানব' বা 'Supreme person' এই মর্ত্যমানবেরই অতীন্দ্রিয় ঊর্ধ্বায়িত সংস্করণ। এই মহামানব দ্বন্দ্ব-বিভেদ-জর্জর পৃথিবীর বুকে নতুন চেতনার আলোক নিয়ে আসবেন—নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবেন। জীবন-সায়াহ্নে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেই আসন্ন মহামানবের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে কবিগুরু লিখেছিলেন—

"ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে 'উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—

এল মহাজনমের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।'

এই মহামানব ব্যক্তিমানব নন—সর্বসংস্কারমুক্ত বিশ্বমানব। বিশ্বমানব-চৈতন্যের প্রভাবে ব্যক্তিসত্তা অখণ্ড চিন্ময় মানবসত্তায় উন্নীত হয়।

আপন অন্তরের মধ্যে বিশ্বমানবসত্তাকে উপলব্ধির ভাগবতস্বরূপের নামই 'নারায়ণ'। আপন সত্তার মধ্যে বিশ্বসত্তার এই যে উপলব্ধি ভারতীয় ভাষায় তার নাম 'যোগ'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মমত অনুসারে ভাগবত সত্তা মানুষের আপন সত্তার বাইরে অবস্থিত এবং বাইরে থেকেই মানুষ ভগবৎসমীপে ভক্তি নিবেদন করে। ভারতবর্ষেও এ জাতীয় ধর্মের অভাব নেই। কিন্তু উচ্চস্তরের সাধকেরা আপন অন্তরের মধ্যে 'নারায়ণ' উপলিব্ধির অর্থাৎ যোগ সাধনার পথকেই স্বীকার করে নেন। আপন অন্তরের মধ্যে নারায়ণের এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথকে মহৎ চিন্তার অধিকারী মহামানবের মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে।

সুতরাং বিস্তারিত আলোচনা দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মানবতাবোধে, অমরতা ও মুক্তির আদর্শে, দ্বয়ের মধ্যে অদ্বয়বোধে এবং সর্বেশ্বরবাদের পরিকল্পনায়। কিন্তু তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রেরণামূলে আছে উপনিষদ। অন্যভাবে বলা চলে, উপনিষদ তাঁকে ভাবরসে রসায়িত করে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার বিকাশে সহায়তা করেছে, তাঁকে প্রেরণার উপকরণ যুগিয়েছে প্রচুর আর সেই উপকরণ দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতস্বাদ নব রসায়ন পরিবেষণ করেছেন।

ঔপনিষদিক ভাবাদর্শের প্রেরণায় সৃষ্টি রচনাগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে। 'অহং ও আত্মা', 'সুখ-দুঃখ', 'জীবন-মৃত্য', প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনার এক কথায় তাঁর জীবন-দর্শনের মূল কথাগুলি ওইসব আলোচনা-গুলির মধ্যে পাই। ঔপনিষদিক চেতনা কবিকে মানবচেতনা থেকে দিব্যচেতনায়, কবিত্ব থেকে ঋষিত্বে উন্নীত করেও তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ' —শীর্ষক প্রবন্ধ —কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

৪০৪.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন কবি বা সাহিত্যিক নন, একজন গভীর চিন্তাসম্পন্ন দার্শনিকও বটে।—একথার তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

২। কবি রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪০৪.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (একক ১৩ থেকে ১৬)

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী-১৯৬১)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (১-২ খণ্ড, ১ম সং)—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৩। উপনিষদ—বিধুশেখর ভট্টাচার্য।

৪। উপনিষদ প্রসঙ্গ—(শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী)—শ্রীঅরবিন্দ।

৫। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (ঈশ-কেন-কঠ)—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

৬। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (উদ্বোধন)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

৭। উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস (১ম সং, ১৩৬৮)—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৮। মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। রবীন্দ্র দর্শন (২য় সং, বৈশাখ-১৩৩৩)—হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ (১ম সং)—প্রমথনাথ বিশী।

১১। Indian Philosophy—Dr. S. Radhakrishnan.

১২। Religion of Man—Rabindranath Tagore.

১৩। Sadhana—Rabindranath Tagore.

১৪। Personality—Rabindranath Tagore.

১৫। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতি সাহিত্য—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

ডিএসই-৪০৪
বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৩
'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'

একক-৯
প্রথম পত্র, দ্বিতীয় পত্র, তৃতীয় পত্র

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৩.৯.১ : প্রথম পত্র

৪০৪.৩.৯.২ : দ্বিতীয় পত্র

৪০৪.৩.৯.৩ : তৃতীয় পত্র

রবীন্দ্রনাথের যখন সতেরো বছর বয়স তখন আমেদাবাদ থেকে তিনি বিলেতের জন্য রওনা দিলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ। মেজদা তখন তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের নিয়েই ওখানে থাকতেন। তিনি ঠাকুরবাড়িতে বৌঠানকে একাধিক চিঠিতে পর পর বিলেতযাত্রার কথা এবং বিলেতযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা জানান। এসময় 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন। সেখান গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা লিখে পাঠিয়েছেন তা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত অংশকে বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকুকে ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। জাহাজে করে পুনা থেকে ইডেন বন্দরে পৌঁছে ছিলেন। এখান থেকে তিনি যখন লন্ডনে পৌঁছান এবং লন্ডনে বসবাস করতে লাগলেন। ইংল্যান্ড বাসকালে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার যে চিত্র পাওয়া যায় তা 'ভারতী'তে বৈশাখ ১২৮৬ থেকে শ্রাবণ ১২৮৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে প্রকাশিত ১৩টি পত্র একত্রিত হয়ে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) নামে পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ কল্পনা, রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ বসবাসের কাহিনী, সেখানকার মানুষ, পারিপার্শিক পরিবেশ, ভূগোল এবং তাঁর যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ঘটেছিল তার সবই এখানে বর্ণিত হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ বিলেতের বিভিন্ন জায়গায়, সেখানের আইনসভায় রাজনৈতিক তরজা,

বিলেতের নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং এদেশের নর-নারীর জীবন ইত্যাদি প্রসঙ্গ অসামান্যভাবে ফুটে উঠেছে এই পত্রগুলিতে। যেহেতু 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' পত্রাকারে লেখা, সেহেতু এটি চলিত ভাষায় লেখা হয়েছিল। সাহিত্যে চলিত ভাষার লেখনী হিসেবে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রথম চলিত ভাষার গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। আর এছাড়া যেহেতু ইউরোপীয়রা এবং এদেশীয়রা ইউরোপ থেকে ঘুরে এদেশে এসে তারা সকলেই অত্যন্ত অতিমাত্রায় মুগ্ধতার সহিত ইউরোপের বর্ণনা করে থাকেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ভাবনা, নিজস্ব মন্তব্যকে পত্র মারফৎ আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত করেছেন। যার ফলে প্রতিটি পত্রে তাঁর নিজস্ব জীবনভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে ফুটে উঠেছে তারও প্রকাশ ঘটেছে। তাই 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' আমাদের কাছে বিশেষভাবে আদরণীয়।

৪০৪.৩.৯.১ : প্রথম পত্র

সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বিলেত ভ্রমণ করেন। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এ ১৩টি পত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিলেত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। প্রথম পত্রের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— 'বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা পুনা স্টীমারে উঠলেম'। ২০-২৬ শে সেপ্টেম্বরে স্টীমার যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের মন মানসিকতার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবহাওয়ার সাথে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। ছ'দিন পর যখন কবি শয্যা ছেড়ে উঠলেন, তখন দেখলেন আসলেই তিনি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। দুর্বলতা কাটিয়ে কবি এডেনের পথে যাত্রা করেন; ছ'দিনের পর কবিরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন দেখলেন আগের অশান্ত সমুদ্র শান্ত হয়েছে। শান্ত পরিবেশে দুপুরবেলা কবির চোখে পরিলক্ষিত হয় একটা ছোট্ট নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চলেছে, তারা আরব-দেশীয়, মস্কো যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে কথোপকথনে জানা যায় দিক ভ্রমণের ফলে তাদের জল শেষ হয়েছে এবং পুনা স্টীমার তাদেরকে জল দিয়ে সাহায্য করল। ২৮শে সেপ্টেম্বর, শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই কবি দেখেছেন সম্মুখে পাহাড়-পর্বতের বিচিত্র দৃশ্য। এখানে কবির মনে সমুদ্রের উপর একটা অশ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট হয়; কল্পনায় কবি সমুদ্র নিয়ে যেমনটা ভেবেছিলেন বাস্তবের সঙ্গে তা অনেকটাই অমিল-

"তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না।"

সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে তখন সমুদ্রকে অনেক সুন্দর দেখায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ কবির মনকে নাড়া দিতে পারে না, কবির এতে অসুস্থ বোধ করেন।

জাহাজ যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে বিচিত্র দৃশ্যের প্রভাব প্রকটিত হয়। সমুদ্রের বর্ণনার সাথে সাথে তিনি নারী পুরুষেরদের একটি বিচিত্র স্বভাব ও চিন্তা চেতনার দিকটি পরিস্ফুট করেন। কবি ইউরোপবাসীদের অমার্জিত আচরণেরও পরিচয় দিয়েছেন। এডেন থেকে সুয়েজ যেতে কবির পাঁচ দিন লেগেছিল। সুয়েজে নেমে নৌকায় করে কিছুটা পথ পার হয়ে ট্রেনে করে আলেকজান্দ্রিয়ায় বন্দরে পৌঁছে যান। সেখান থেকে ইতালি পৌঁছান কবি। কবি জানতেন যে, আফ্রিকা এক অনুর্বর মরুভূমির নাম। বইয়ে তিনি তেমনটিই পড়েছেন, কিন্তু বাস্তবে তার

উল্টো। রাস্তার দুপাশে তিনি বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত ও থোকায় থোকায় খেজুর গাছ দেখেছেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা ধুলোবালি মিশ্রিত শরীর নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে মঙ্গোলিয়া জাহাজে চেপে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দেন। আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধশালী, সেখানে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় দোকান। বিভিন্ন দেশের মানুষ ও হরেক রকমের দোকানে শহরটি ঘেরা রয়েছে। এখানকার বিশাল বন্দরে ইউরোপীয় মুসলমান সব ধরনের জাতির জাহাজ আছে। শুধুমাত্র হিন্দুদের কোনো জাহাজ নেই। এই বৈষম্যতা লেখকের মনকে বিষন্ন করে তোলে।

রবীন্দ্র মননে ভ্রমণ পিপাসার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি ইটালিতে পৌঁছে যান। তাঁর কৌতূহলী মনে ইটালির প্রতিচ্ছবি উঁকি মারে। তিনি পত্র আলোচনায় বলেছেন—

> "এই তো প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। জানোই তো আমি কিরকম কাল্পনিক মনে করেছিলাম য়ুরোপে পৌঁছিয়েই কি এক অপূর্ব দৃশ্য চোখের সম্মুখে খুলে যাবে! সে যে কী তা কল্পনাতেই থাকে, কথায় প্রকাশ করা যায় না।"

রবীন্দ্রনাথের কাল্পনিক মনে য়ুরোপের চিত্র নতুন হয়ে দেখা দেয়নি। তিনি ইটালিতে প্রবেশ করে ইটালির সুন্দর মেয়েদের সাথে নিজের দেশের মেয়েদের ভাব সাদৃশ্য খুঁজে পান এবং ইটালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে লেখক প্যারিস রওনা হয়ে লন্ডনে পৌঁছে যান।

৪০৪.৩.৯.২ : দ্বিতীয় পত্র

দ্বিতীয় পত্রালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংল্যান্ডের বিচিত্র বর্ণনার সাথে নারী ও পুরুষের বিস্তারিত বর্ণনা পরিস্ফুট করেছেন। কবির চোখে ধরা পড়েছে ভারতবর্ষের মেয়েদের চেয়ে ইংল্যান্ডের মেয়েদের সাজগোজের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ, আর পড়াশোনাকে তারা আমোদ প্রমোদ হিসেবেই বেছে নেয়। বিলাতে এসে লেখক সবচেয়ে যে জায়গায় নিরাশ হয়েছেন তা হল দ্বারে দ্বারে মদের দোকান কিন্তু বইয়ের দোকানের দেখা মেলেনি। একদিন শেলীর কবিতার প্রয়োজন হয়েছিল এবং সে বই একজন খেলনাওয়ালাকে আনতে হুকুম দেওয়া হয়েছিল। অথচ কবি জানতেন যে—

> "আমি আগে জানতাম এদেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন দরকারী। একটা বইয়ের দোকানও তেমনি।"

ইংল্যান্ডের লোক এতটাই ব্যস্ত ভাব নিয়ে চলাফেরা করে যে রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল করলে দেখতে মজা লাগে। কবি লন্ডন থেকে ব্রাইটনে আসার সময় চোখের সামনে হুস হুস করে ট্রেন চলতে দেখেছেন। ক্রমে ক্রমে ব্রাইটনের দু-একজন লোকের সঙ্গে কবির আলাপ হওয়াতে সমস্ত দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এখানকার মানুষ এতটাই ব্যস্ত যে তারা জানে যে শেলী বলে একজন কবি তাদের দেশে জন্মেছে, কিন্তু শেলী যে 'চেঞ্চি' (Cenci) নামক একটি নাটক লিখেছেন বা তাঁর 'Epipsychidion' নামে একটি কবিতা আছে তা তারা জানতেন না। কবি রবীন্দ্রনাথের মুখেই প্রথম P-ডাক্তার সে কবিতার নাম শুনতে পেলেন।

৪০৪.৩.৯.৩ : তৃতীয় পত্র

ইউরোপ প্রবাসীর তৃতীয় পত্রে লেখক জানান ফ্যান্সি বল অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচের কথা। স্ত্রী পুরুষেরা সেজেগুজে দলে দলে হাত ধরাধরি করে একটা প্রকাণ্ড আলোকাকীর্ণ ঘরে নাচে, আর তার চারিদিকে নানারকম বাজনা বাজতে থাকে। এমন মহা সমারোহ যে ঘরে তিল ধারনের স্থান নেই। কোথাও বা শ্যাম্পেনের ফোয়ারা, কথাও মদ ও মাংসের ছড়াছড়ি। একেক জনের আবার নাচের বিরাম নেই। এই নাচের অনুষ্ঠানে একজন মেম তুষার কুমারীর ন্যায় শ্বেতশুভ্র বসনে নিজেকে সুসজ্জিত করে তুলেছিলেন। অপর একজন মুসলমানিনী সেজেছিলেন। পরনে তার লাল ইজের, রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপি। একজন সেজেছিলেন দেশী মেয়ে। দেশীয় ঢঙ্গে শাড়ী ও কাঁচুলিই ছিল তার প্রধান সজ্জা। লেখকের মতে, ইংরেজি কাপড়ের চেয়ে তাকে ঢের বেশী ভালো দেখাচ্ছিল। একজন সেজেছিলেন বিলাতী দাসী। লেখক রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন বাংলার জমিদারের সাজ সেজেছিলেন। জরি দেওয়া মখমলের কাপড় ও পাগড়ী ছিল তার প্রধান আভূষণ। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে কেউ অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন, কেউ বা সেজেছিলেন আফগান সেনাপতি। লেখক সেখানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রনে যান। সেখানে সান্ধ্যকালীন আসরে পাতলা কালো বনাতের কাপড় পরাই হল রীতি। তবে শীতের জন্য মোটা গরম কাপড় পরতে হয়। সান্ধ্য পোশাক একেবারে নিষ্কলঙ্ক সাদা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বুক খোলা কালো ওয়েস্টকোট, সাদা কামিজ, গলায় সাদা নেকটাই, এবং একটি টেলকোট এই ছিল পোশাক। নাচের পার্টিতে একজোড়া সাদা দস্তানা পরতে হতো। অন্য স্থানে মহিলাদের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করতে হলে দস্তানা খুলে করতে হয়, তবে নাচের পার্টিতে দস্তানা পরাই ছিল রীতি। যাতে মহিলাদের হাতে খালি হাত লেগে তাদের হাত মলিন না হয়ে যায়। লেখক যখন সান্ধ্য আসরে পৌঁছান তখন সাড়ে নটা, নাচ তখনো আরম্ভ হয়নি। গৃহকর্ত্রী সেখানে অভ্যাগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। অনুষ্ঠান কক্ষে শত শত রূপসীর ঔজ্জ্বল্যে কৃত্রিম আলো ম্লান। ঘরের একপাশে বেহালা, পিয়ানো, বাঁশি, ঘরের চারধারে কৌচ ও চৌকি সাজানো। নাচবার ঘরের মেঝে কাঠের। পালিশ করা কাঠের মেঝে নাচবার উপযুক্ত কারণ তাতে পা কোন বাধা পায় না। ঘরে ঢুকবার সময় সকলের হাতে সোনার অক্ষরে ছাপা কাগজ দেওয়া হয়। সেই কাগজে কি কি নাচ হবে তা লেখা থাকে। ইংরেজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক হলো স্ত্রী-পুরুষ মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা।এতে দুই জন এক সঙ্গে নাচতে পারে। একে রাউন্ড ডান্স বলে। আরেক রকম হলো চারটি জুড়ি চতুষ্কোণ হয় একে অপরের সামনে দাঁড়ায় ও হাত ধরাধরি করে নানা ভঙ্গিতে চলাফেরা করে, একে 'স্কয়ার ডান্স' বলে। নাচবার অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলারা একে অপরের সাথে পরিচিত হবার পর তাদের সঙ্গে নাচবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং উভয়ে রাজি হলে তারা একসাথে বিভিন্ন নাচে অংশ নিতে পারে। লেখকের নাচের নিমন্ত্রণে নতুন লোকেদের সাথে খুব সহজে আলাপ করে নিতে পারেননি। তবে সকল বৃত্তান্ত তার সুচতুর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। শত শত শ্বেতাঙ্গিনীর মধ্যে লেখকের নজর কাড়ে এক ভারতবর্ষীয় শ্যামলা মুখশ্রী।

ইউরোপের দেশে সূর্যের দেখা পাওয়া ভার। তাই যেদিন সূর্য ওঠে সকলেই রবির কিরণ আস্বাদনের জন্য ঘর হতে বাহিরে বেরিয়ে পড়ে। লেখক তার নিজ অভ্যাস মতো সকাল ছ'টার সময় বিছানা ছেড়ে উঠে স্নান সারেন, যা ইউরোপীয় লোকের কাছে বিড়ম্বনা। সকাল ন'টায় প্রাতঃরাশ, দুপুর দেড়টায় মধ্যাহ্ন ভোজন, এবং রাত আটটার সময় নৈশ ভোজ, এভাবেই দিনের প্রধান বিভাগগুলি আবর্তিত হয় মূলতঃ খাওয়া নিয়ে। বিকাল চারটে বাজলেই চারিদিকে আলো কমে আসে। আমাদের দেশের মেঘ, ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে একটা উল্লাসের ভাব আছে। বিলেতে সমস্ত আকাশটা যেন একটা অবসন্ন মুখশ্রীর ন্যায়। তবে ইউরোপে ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণকায় জাতি যে একটা তাচ্ছিল্যের বিষয় তা লেখকের ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

পর্যায় গ্রন্থ : ৩
'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'

একক-১০

চতুর্থ পত্র, পঞ্চম পত্র, ষষ্ঠ পত্র

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৩.১০.১ : চতুর্থ পত্র

৪০৪.৩.১০.২ : পঞ্চম পত্র

৪০৪.৩.১০.৩ : ষষ্ঠ পত্র

৪০৪.৩.১০.১ : চতুর্থ পত্র

লেখক হাউস অফ কমন্সে গিয়েছিলেন। সেখানে পার্লামেন্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রাসাদোপম ঘরবাড়ি, গ্যালারি, খবরের কাগজের রিপোর্টারগণ, এসব মিলিয়ে এক অভিনব কর্মযজ্ঞ চলছিল। এখানে গ্যালারি অনেকটা থিয়েটারের ডেস্ক সার্কেলের মতো। গ্যালারির নীচে মেম্বাররা বসে। একপাশে গভর্নমেন্টের দল, আরেকপাশে বিপক্ষ দল। সামনের কেদারায় বসেন একজন স্পিকার। সেসময় ও'ডোনেল নামে একজন আইরিশ ভদ্রলোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। লেখক পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা সমন্বয় ও বিচারবোধের অভাব তুলে ধরেছেন। সমকালীন সময় ইউরোপের পার্লামেন্টে ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলছিল। হাউস অফ কমন্সে পাঁচ শ্রেণীর গ্যালারি আছে। যেমন—স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি, স্পিকার্স গ্যালারি, ডিপ্লোম্যাটিক গ্যালারি, রিপোর্টার্স গ্যালারি এবং লেডিজ গ্যালারি। লেখক ওই বিশেষ দিনের পার্লামেন্ট হাউসের প্রশ্নকরণ, তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন।

৪০৪.৩.১০.২ : পঞ্চম পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এ যেমন একাধিক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, তেমনি এ পত্রেও তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি তুলে ধরেছেন 'ইঙ্গবঙ্গ'—নামক একপ্রকার জীবের কথা। তারা সে সময়ে নানা উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে পাড়ি দিত। অন্ধকারে থাকা জীবের চোখে হঠাৎ আলো লাগলে যেমন চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তেমনি

সেখানকার বাহ্যিক চাকচিক্যে আত্মবিহ্বল হয়ে ইংল্যান্ডের সমস্ত কিছুকেই তারা বিনা বাক্যব্যয়ে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে। ফলত, স্বদেশের থেকে এই বাঙালিদের ভালবাসার পারদ উত্তরোত্তর চড়ে যায় ইংল্যান্ডের প্রতি। স্বভাবতই ভারতভূমি হয়ে ওঠে উপহাসের, তাচ্ছিল্যের জিনিস। বিদেশীদের কাছে ভারত যত না হেয়-অবমাননার সম্মুখীন হয়, তার থেকে অধিক হয় এই 'ইঙ্গবঙ্গ'দের কাছে।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— 'ইঙ্গবঙ্গ' হয়ে ওঠে তারা, যারা একদিন সমাজের মধ্যে ছিল, অথচ সমাজের কাছে তাদের বিশেষ কোনো জনপ্রিয়তা ছিল না। স্কুলের মাস্টারমশাই যাদের উপর থেকে সমস্ত প্রত্যাশা তুলে নিয়েছিলেন, যাদের বোকামী দেখে একসময় লোক হাসত- সেই তারাই যখন বিলাত থেকে ফিরে আসে 'তখন তার ফুলানো লেজ, বাঁকানো ঘাড়, নখালো থাবা দেখে তোমরা আধখানা হয়ে পিছু হ'টে হ'টে দেয়ালের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নেবে।' কারণ তারা এখন স্বদেশের ছোটোখাটো নানা বিষয়ে খুঁতখুঁতে স্বভাবের, দোষ ধরতে অভ্যস্ত। খাবারে, ব্যবহারে, লোকাচারে এমনকি ঘরের জিনিসপত্র রাখা বিষয়েও তারা তখন খুঁতখুঁতে। লেখকের কথায়—

> "যে দেশেই দেখো-না কেন, ক্ষুদ্র যখনি মহান পদ পায় তখনই সে চোক রাঙিয়ে, বুক ফুলিয়ে, মহত্ত্বের একটা আড়ম্বর আস্ফালন করতে থাকে। এর অর্থ আর কিছু নয়— তারা মহত্ত্বের শিক্ষা পায় নি।"

এরা বিলেতের Land-lady (মালকিন) বা Kitchen-maid-এর সংস্পর্শে কিছুদিন কাটিয়ে স্বদেশে স্ত্রীদের ঘোমটাকে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে করে। রান্নার দিদিদের বড়দিদি বা মেজদিদি ডেকে তাদের সাথে কিছু আমিষ জাতীয় হাস্যালাপ করে নিজ দেশের নারীদের তুলনায় তাদের কতো মহান মনে করে। অথচ বিলাতের কোনো ভদ্র ঘরের নারীদের সাথে তারা কোনোরূপ আলাপ জমাতে পারে না। সেখানে যাবতীয় সংকোচ তাদের ব্যবহারকে যেন অদৃশ্য সীমানার মধ্যে বেঁধে দেয়। অথচ যারা বিলেত থেকে ফিরে দীর্ঘদিন স্বদেশে কাটিয়েছে, তাদের কাছে বিলেত প্রথম বারের মতো তত আকর্ষণীয় মনে হয় না। এজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালিদের বুড়িয়ে যাওয়া মন ও উদ্যমকে দায়ী করেছেন।

৪০৪.৩.১০.৩ : ষষ্ঠ পত্র

লেখকের ব্রাইটনের বাড়িটি ছিল একটি নিরালা জায়গায়। সার দেওয়া বাড়ি যেগুলির নাম Medina Villas। ভিলা নাম শুনে লেখকের ধারণা হয়েছিল হয়তো গাছপালায় ঘেরা সবুজের মধ্যে হবে, কিন্তু তা একেবারেই নয়। একটি সাধারণ ঘিঞ্জি এলাকায় তৈরী বাড়িটি। যদিও তার সামনের দিকে কিছু গাছপালা রয়েছে। ঘরে ঢুকলে ঘরটিও তেমন মনপুত হয়নি লেখকের। বৃষ্টির দিনে তাঁর ভ্রমণকারী মন কখনোই সে ঘরে থাকতে চায়নি। তবে ছোট হলেও কাঠের তৈরী বাড়িগুলো যথেষ্ট পরিষ্কার এবং সাজানো। এই স্থলে লেখক বিলেতের সঙ্গে স্বদেশের পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে- শিল্পজ্ঞান, সৌন্দর্য্যজ্ঞান থেকে এখানকার মানুষের পরিষ্কার ভাবের জন্ম। আর আমাদের দেশে পরিষ্কার বলে যেন একটা স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে। এমনকি এখানকার মানুষের চালচলনেও যেন পরিচ্ছন্নতা- "এখানকার পুরুষেরা টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু এমন করে খোলে যাতে সেই সামান্য টুপি খোলাতেই শ্রী প্রকাশ পায়। বিশেষত এখানকার মেয়েরা প্রতি হাত পা নাড়ায় শ্রীর প্রতি লক্ষ করে।"

লেখকের মতে বিলেতের স্ত্রী-পুরুষের প্রতিটি অভ্যাসেই এই শ্রী রয়েছে। যা তাদের উন্নত শিল্পচর্চাকেই নির্দেশ করে, এবং স্বাভাবিক এই স্বভাবগুলি তাদের বংশধারায় পরিণত হয়। কিন্তু আসল ব্যাপারটি হলো তাদের বাহ্যিক চোখের সৌন্দর্য। কোনো কদর্য জিনিস তারা লোকের সামনে প্রকাশ হতে দিতে চায় না। সে তুলনায় আমাদের

নিজস্ব একটি পরিষ্কার ভাব আছে। এদের দেশের সঙ্গে আমাদের এই পরিচ্ছন্ন ভাব যদি মিলে যেতে পারতো, তবে সর্বাঙ্গসুন্দর একটি সমাজ গড়ে উঠতো। আমাদের সুন্দর দেখার প্রতি ততোটা ঝোঁক নেই। এর কারণ আমাদের দেশ গরীব। সেখানে সৌন্দর্যের প্রাধান্য তেমন নেই। কিছু প্রাত্যহিক কর্ম আমরা পরিষ্কারের অভ্যাসবশত করে চলি। যেমন- এখানে যে পুকুরে ময়লা ফেলা হয়, সেখানেই স্নান করে আমরা নিজেদের শুদ্ধ বলে মনে করি। আমরা আমাদের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে গিয়ে নিজেদের ঘরটাকে অপরিষ্কার করে ফেলি। আসলে আমাদের দেশ হলো গ্রীষ্ম প্রধান, অত্যধিক গরমে ঘর্মাসিক্ত নোংরা আমাদেরকে পঙ্কিল করে তোলে। কিন্তু ইউরোপ শীতপ্রধান, তাই জলের ব্যাবহার সেখানে তুলনায় খুবই কম, নেই বললেই চলে। এই বিষয়টি বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য'তে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানে বিদেশি এবং ভারতীয়দের পরিষ্কার সম্বন্ধে নানান বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

ব্রাইটনে লেখকের সঙ্গে আলাপ হয় (আত্মহঙ্কারী) Dr. M এর সঙ্গে। এখানকার কিছু প্রচলিত রীতি সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় তিনি লেখককে রীতিমত 'Uneducated' বলেই মনে করেন। তাদের ধারণা, ইউরোপের অনেক কিছু ছোটোছোটো বিষয় নিজেদের মতো ভারতীয়দেরও জানাটা স্বাভাবিক। এক আমন্ত্রণ সভায় miss K এর সাথে লেখকের আলাপ হয়। তারা অত্যন্ত সাধাসিধে প্রকৃতির। বিভিন্ন কাজকর্ম তারা দেখাশোনা করতেন। বড়োজন গম্ভীর হলেও ছোটটি হাসি গানে মাতিয়ে রাখতেন। একদিন লেখক নিমন্ত্রিত হলেন Dr. M এর বাড়ি। নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদের জন্য সেই নিমন্ত্রণ। লেখক নিজেও কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় গানের মর্যাদা এদের কাছে তেমন নেই।

আরেকটি বিষয়ে লেখক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন সেটি হল বিদেশের নানা জমায়েত এর সাথে ভারতবর্ষের নানা জমায়েতের পার্থক্য ও উভয় জায়গায় নারীদের অবস্থান। আমাদের দেশে কোনো আমন্ত্রণ সভায় বা গৃহে সাধারণত আমরা যাই যেন ভুরি ভুরি খাবার খেয়ে তাদের কৃতার্থ করতে। কিন্তু ইউরোপে এর ঠিক উল্টো। সেখানে কোনো বাইজি বা গাইয়েকে দিয়ে অনুষ্ঠান করানো হয় না, বা দর্শকের মতো কেবল হাত তালিতেই দায়িত্ব সমাপ্ত হয় না। সেখানে আমন্ত্রিত সবাই নিজেরা গান, বাজনা, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। সেখানে একের সাথে অন্যের সংযোগ, ও নিজের ভিতরের পারদর্শিতা দেখানোই যেন আসল উদ্দেশ্য। খাবার সেখানে গৌণ।

পাশাপাশি নারীদের অবদান ইউরোপে না দেখলে ঠিক অনুমান করা অসম্ভব। কেননা, আমাদের দেশে নারীরা পুরুষদের সাথে একই সভায় সমানভাবে যোগদান করে কোনো মুখ্য ভূমিকা পালন করছে, এটা যেন আমরা ঠিক কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু বিদেশে সেটা পর্যবেক্ষণ করলে আমাদের আফসোস হবে। কেননা নারীরা সেখানে সম্মানের সাথে সবকিছুতে যোগদান করে। এর মাধ্যমে কখনো সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। লেখকের মতে, এমনটা কেবল ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশেই হওয়া দরকার। তবেই সমান মর্যাদায় নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের মান বৃদ্ধি পাবে।

পর্যায় গ্রন্থ : ৩
'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'

একক-১১
সপ্তম পত্র, অষ্টম পত্র, নবম পত্র

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৩.১১.১ : সপ্তম পত্র

৪০৪.৩.১১.২ : অষ্টম পত্র

৪০৪.৩.১১.৩ : নবম পত্র

৪০৪.৩.১১.১ : সপ্তম পত্র

ষষ্ঠ পত্রে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন, যা অনেক সময় ব্যক্তি আক্রমণও হয়ে উঠেছে। ইংল্যান্ডে গিয়েই রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় উভয় দেশের নারীর অবস্থান। নারী স্বাধীন ও শিক্ষিত না হলে পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নতি সম্ভব নয় তা তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন। কিন্তু প্রাবন্ধিকের চিন্তাভাবনা মেনে নিতে পারেন নি সম্পাদক। ফল স্বরূপ 'নোটের বাণ বরষন করেছেন।' রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের বিরুদ্ধে আপন মত রাখতে গিয়ে সপ্তম পত্রে প্রথমেই জানিয়েছেন—

> "খুব সম্ভব, কোনো উদ্ধত যুবক সম্পাদকের ক্ষমতা নিজের তরুণ স্কন্ধে গ্রহণ করে ভারতীর এক কোণে অলক্ষিতভাবে এই নোটটি গুজে দিয়েছেন।"

এরপর তিনি একে একে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। স্বাধীনতার সাথে শোভনতা, বিনয়, লজ্জা, সরলতা, দয়া ইত্যাদি গুণের কোনো বিরোধ তো নেই-ই, বরং এরা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের 'নারী স্বাধীনতা' বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন নি বলেই স্বাধীনতার সাথে উক্ত গুণাবলীরও প্রয়োজন আছে বলে জানিয়েছেন, যা প্রাবন্ধিকের কাছে 'সরলহৃদয় পাঠকের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া' অন্য কিছু মনে হয় নি। সম্পাদকের মতে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা না হলে স্ত্রী স্বাধীনতা সম্ভব নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যুক্তি, একটি স্বাধীন না হলে যে অপরটি স্বাধীন হবে না তার কোনো যথার্থ্যতা নেই। লেখকের ধারণা, সম্পাদক হয়ত বিশ্বাস করেন যে,দেশ এখনো নারী স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত নয়—

"যদি বা স্ত্রীস্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে এখনও না এসে থাকে তবে সেই সময় যত শীঘ্র আসে আমাদের তার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমে আন্দোলন, তার পরে কাজ,তার পরে সিদ্ধি। সময় আসে নি বলে যদি মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে হয় তাহলে সময় কোনো কালে আসে না।"

'মেলামেশা', 'আমোদ-প্রমোদ', 'পরপুরুষ' ইত্যাদি শব্দগুলো যে ভাব অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন, প্রাবন্ধিক তার ব্যাখ্যা করেছেন হীন রুচি অনুযায়ী। সাংসারিক কাজের জন্য স্ত্রীদের ঘরে রাখা হয়, পুরুষদের স্বার্থের জন্য নয়- এই প্রায় চিরন্তন মন্তব্যের বিপক্ষে প্রাবন্ধিক জোরালো ভাবে মতামত রেখেছেন এবং শেষে যে জিজ্ঞাসাটি রেখেছেন তার মীমাংসা বহু পুরুষ আজও করে উঠতে পারেনি, পারেননি সম্পাদকও হয়ত বা-

"অন্য লোকের সঙ্গে মেশা কি স্বামীর প্রতি অপ্রীতির চিহ্ন?"

ঠিক এখান থেকেই কি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ নিজেকে এবং তার স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ককে বিচার করে দেখে নিতে চেয়েছিল?

৪০৪.৩.১১.২ : অষ্টম পত্র

বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" পাশাপাশি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি কেমন ভাবে জগত-জীবনকে দেখতে হয়, কেমন ভাবে ভ্রমণ নিছক ঘোরা না হয়ে। হয়ে ওঠে আলোকিত তরঙ্গ, যা একই সাথে নিজেকে এবং অপরকে জানতে, বুঝতে সাহায্য করে। অষ্টম পত্রে রবীন্দ্রনাথ বিলাতি সমাজের উচ্চবিত্তের নারীদের জীবন যাপনকে যেমন দেখিয়েছেন খানিকটা কৌতুকের ছলেই, তেমনি মধ্যবিত্ত নারীদের অপারগতাও তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্বকে অনন্য নিপুণতায় ব্যাখ্যা করেছেন।

বিলেতে বড়োমানুষের মেয়ে বা স্ত্রীদের কোনো কাজই করতে হয় না, কেননা house-keeper, nurse, governess, lady's maid সহ নানা ধরনের মানুষ কাজ করার জন্য বাড়িতে থাকে। ফলে তাদের ঘুম ভেঙে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসতেই দুপুর, যদিও সকাল এগারোটা তাদের কাছে তখনও morning। তারা যে স্নান করে না এই ছবি আমরা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থেও যেমন দেখি, এখানেও তাই। ভারতীয়দের নিত্য স্নান তাদের কাছে আশ্চর্যের এবং নিজেদের কাছে তা fashion ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই নারীরা কেবল মুখ আর হাত বারবার ধোয় এবং বাড়িতে আসা নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলে। লক্ষ্যনীয় তারা গল্প করে না বা আড্ডা দেয় না। প্রত্যেকের সঙ্গে সমভাব— 'বিশেষ কারও সঙ্গে বেশি কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশি যত্ন করা কোনোমতে উচিত নয়।' এই ধরনের দুরূহ কাজ নিত্য অভ্যাসের ফল বলেই প্রাবন্ধিক মনে করেন। এরা লাইব্রেরী থেকে নভেল তুলে এনে কেবলই পড়ে আর প্রেমে পড়ে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'flirt' ও 'love-making'-এর মধ্যে যে তুলনাটি করেছেন তা বিশেষ উল্লেখ্য—'রসিকতা হাসি তামাসা ও মিষ্টি কথার ক্ষণস্থায়ী গোলাগুলি -বরষনের নাম flirt করা। আর অন্যটি এটির চেয়ে আর একটু গম্ভীর ও স্থায়ী পদার্থ।' এহেন জীবন ও যাপনের প্রতি খানিকটা করুণাই প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে— 'এই রকম ফড়িং-এর মতো ঘাসে ঘাসে লাফালাফি করে তাদের জীবন বসন্তকাল কাটে।'

আমাদের দেশে মেয়েদের যেমন ছেলেবেলা থেকেই বিয়ের জন্য লেখা পড়া না শিখিয়ে প্রস্তুত করা হয়, তেমনই এদের গান, পিয়ানো, নাচ ইত্যাদি শেখানো হয়। বস্তুত একটি 'দিশি পুতুল' অন্যটি 'বিলিতি পুতুল' এই যা তফাত।

মধ্যবিত্ত নারীদের মেহনত করতে হয়। তারা প্রয়োজনীয় কাজের জন্য সামান্য পড়াশোনা করলেও বইপত্র বা কাগজ বিশেষ পড়ে না, স্বামীর লাইব্রেরিতেও যায় না, যেহেতু সেগুলো (বিশেষত রাজনীতি) তাদের কাজ নয় বলেই তারা মনে করে। যদিও লেখক তাদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি— 'আসল কথাটা হচ্ছে, ইচ্ছে নেই। ...politics যদি নভেলের ভায়রা-ভাই হত,তা হলে তারা পুরুষের পাত থেকে politics নিয়ে দু হাতে করে গিলতেন।" দুর্বলতা মেয়েরা গৌরবের চোখে দেখে আর পুরুষও তা ভেঙে দিতে চায় না বরং আশ্রয় দেওয়ার গৌরব লাভ করে। কিন্তু এই মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। শিক্ষা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, আমোদ, আহ্লাদ-ই যে সম্পর্ক সুন্দর রাখার উপায় তা তিনি স্পষ্ট করেই বলতে চেয়েছেন। আর তাই যে বাড়িতে একদা তিনি ছিলেন সেই বাড়ির স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যে ছবি তিনি তুলে ধরেছেন তা আমাদের দেশের সঙ্গে হুবহু যেন মিলে যায় এবং যা আজও বিদ্যমান। নিছক একসাথে থাকা— বাকিটা অশ্রদ্ধা, অসম্মান এবং শূণ্যতার ইতিকথা।

৪০৪.৩.১১.৩ : নবম পত্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এর নবম পত্রে ইউরোপ সম্পর্কে তাঁর নূতন সংস্কার এবং পুরনো সংস্কারগুলির যে পরিবর্তন ঘটেছে তা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এই চিঠির প্রধান বিষয় হলেন লেখক নিজে। লেখক লন্ডনে দু-এক ঘন্টা থেকেই প্রস্থান করেন সমুদ্রের ধারের শহর ব্রাইটনে। শৌখিন শহরটিতে পৌঁছে আশ্রয় নিলেন পরিচিত এক বাঙালি পরিবারে। সেখানে গিয়ে তিনি অবাক হলেন এই দেখে যে সেখানেও বাঙালি জননীর মতোই মা তার সন্তানদের দশভূজার মতোই পালন করছেন। তার কাপড় দেখেও লেখক অবাক, তাঁর বিদেশী বন্ধুর বক্তব্য-

> "ঐ রকম ভাঁজ ভাঁজ কাপড়ে যে একটি সুন্দর শ্রী আছে, তা আঁটো-সাঁটো, ছাঁটা-ছোঁটা গাউনে পাওয়া যায় না।"

বিদেশিদের পোশাক সম্পর্কে অনেকেই নানান মত ব্যক্ত করেছেন। কারও মতে এই পোশাক অতি সুশ্রী, আবার কারও মতে তা একেবারেই নয়। তবে লেখক তেমন করে এই পোশাক বিতর্কের মধ্যে জড়াননি। তিনি ব্রাইটনে বসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে তাদের নানান আহ্লাদে আটখানা হয়ে চিঠিটি লিখতে শুরু করেছেন।

লেখক এরপর মত ব্যক্ত করলেন আমাদের দেশের সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে। তাঁর মতে, আমাদের দেশে ছোটদের সর্বদা গুরুজনদের মান্য করে চলতে হয়। বিদেশের সম্পর্কগুলি দেখে লেখকের মনে এমন পার্থক্য বোধ জেগে ওঠে। আসলে লেখক মনে করেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে কেবল ভক্তি আছে, তাতে ভালোবাসা নেই। আমাদের দেশের শাস্ত্র আমাদের আজ্ঞা করে, বুঝিয়ে বলে না। ছোটদের সম্পর্কে বড়োদের মনোভাবও ঠিক তাই, তারা আদেশ করে কিন্তু তার পিছনে কোনো যুক্তি তারা দেখায় না। বয়সে যারা ছোট তারাই মাথা নীচু করে থাকবে এমনটাই তাদের মত। আসলে ছোটদের থেকে ভক্তি আদায় করবে এটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ভালোবাসা বিনা তো কোন সম্পর্কই পূর্ণ হয় না। যে সম্পর্কে ভক্তি আছে কিন্তু সাথে আছে প্রগাঢ় ভালোবাসা, প্রকৃত মুক্তি তো সেখানেই। মুক্তির মধ্যেই অন্তহীন ভালোবাসা লুকিয়ে আছে। পাত্রভেদে এই ভালোবাসার স্বরূপগুলিও পাল্টাতে থাকে। লেখকের আশঙ্কা এইভাবে ক্রমাগত ঠিক ভুল না জেনে ছোটরা যদি গুরুজনের ভিত্তিহীন নির্দেশগুলি পালন করতে থাকে তবে তার মনে কুসংস্কারের জন্ম হবে এবং সে নিয়মহীন দাসে

পরিণত হবে। কিন্তু প্রকৃত ভক্তি যেখানে এবং যাকে করা উচিত তা করতে হবে। তবে লেখকের মতে বিদেশে এই ভালোবাসাহীন ভক্তির ভাবটি নেই। তাদের প্রতিটি সম্পর্কেই অবাধ স্বাধীনতা এবং ভালোবাসা রয়েছে, যা হয়তো লেখককে সেইসময় মুগ্ধ করেছিল।

অনেক লেখকও আছেন যারা জোর দিয়ে পাঠককে নিজের বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, একজন লেখক পাঠকের কাছে এমন বিশ্বাসের জন্ম দেবেন যে, লেখকই হলেন সর্বজ্ঞ, তার উপরে কেউ কিছুই বলতে পারে না। আসলে আমাদের শাস্ত্রকারেরা প্রাচীন কাল থেকেই নিজেদের শ্রম সংক্ষেপ করার জন্য যুক্তিকে বিভীষিকা রূপে দেখিয়ে আসছেন। মানুষের বিশ্বাস মতো বয়সে বা গুণে বড়ো হলেই যে সে শ্রেষ্ঠ হবে, তবে ইংরেজরা বাঙালির তুলনায় জ্ঞানী ও গুণী হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাদের পরাধীনতা স্বীকার করে নিই না কেন? কেন তাদের থেকে স্বাধীনতার প্রত্যাশা করে মানুষ? আসলে বড়োদের এই একাধিপত্যকেই প্রাবন্ধিক অন্ধ একাধিপত্য বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশের ছেলেরা প্রশ্ন করে করে জবাব বিনা অস্থির হয়, কিন্তু তারা যদি নিজেদের কৌতূহল নিবৃত্তির যথোপযুক্ত সুযোগ পেতো তবে তাদের স্বাস্থ্য এবং মন উভয়েই স্ফূর্তি দেখা দিত, যেমনটা বিদেশে হয়। আবারও বিদেশের প্রসঙ্গ টেনে বললেন, টর্কিতে থাকাকালীন এমনি একটি ছেলের সাথে লেখকের আলাপ হয়, যে কিনা প্রশ্নবাণে নিয়ত তাঁকে বিদ্ধ করতে থাকে। সেখানকার ছেলেরা প্রায় প্রত্যেকেই স্বাধীন, কারণ বড়োরা তাদের পদে পদে নিজেদের বিচার বিবেচনা দ্বারা আটকে রাখতে চান না। সেখানে স্কুলেও তারা এই স্বাধীনতা পায়। শিক্ষকরাও তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের এমনি স্বাধীনতা দেন ও বন্ধুভাবে মেশেন যা নাকি তাদের বিকাশে বিশেষ সহায়ক বলে লেখক মনে করেছিলেন।

আমাদের দেশে মনিব এবং ভৃত্য দুজনে একেবারেই দুই প্রান্তের মানুষ। এদের মধ্যে কোনো সহৃদয়তার সম্পর্ক কখনোই থাকতে পারে না। কিন্তু বিদেশে একেবারেই উল্টোটা হয়। তারা ভৃত্যকে দিয়ে কাজ করায় ঠিকই কিন্তু তার বিনিময়ে Please বা Thank you. অর্থাৎ 'অনুগ্রহ' শব্দটি উচ্চারণ করতে তারা কখনোই ভোলে না। আসলে বিদেশে মানুষের মধ্যে প্রভুত্ব ভাব আর ভৃত্যের মধ্যে দাসত্ব ভাব নেই। লেখক এই প্রসঙ্গে এমন একটি পরিবারের কথা বলেছেন, যেখানে রান্না করার জন্য রাঁধুনির অনুমতি অবধি নেওয়া হত, পাছে সে বিরক্ত হয় এই কথা ভেবে। আসলে এটি এখানকার রীতি তথা সংস্কৃতি, এখানে কেউ কাউকে আজ্ঞা করে না আর কেউ তা নিজেকে দাস ভেবে পালনও করে না। আসলে যারা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি তারা সহজেই অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করতে পারে ও অন্যকে নিজের দাসত্ব গ্রহণও করাতে পারে। আমাদের দেশের এক একটি পরিবার আসলে দাসত্বের শৃঙ্খল, আমরা তাকে লোহার শৃঙ্খল না বলে সোনার শৃঙ্খলের আখ্যা দিই মাত্র। লেখকের মতে, হিন্দুদের মধ্যে এই শৃঙ্খলের বিস্তর বাঁধাবাঁধি। তাদের প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যেই গাম্ভীর্যের ব্যাপকতা। রবীন্দ্রনাথের মতে—

> "যাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘন্টা অনবরত থাকতে হবে তাদের সঙ্গে যদি মন খুলে কথাবার্তা না কবে, প্রাণ খুলে না হাসবে, তাদের কাছেও যদি জিবের মুখে লাগাম লাগিয়ে, ...তা হলে কোথায় গিয়ে আর বিশ্রাম পাবে?"

বাড়িতেও যদি মানুষকে এই লৌকিকতার মুখোশ পড়ে থাকতে হয় তাহলে তো মানুষের সহজ ভাবটা হারিয়ে গিয়ে সে হয়ে পড়বে মেকি। লেখক বলেছেন, বিদেশে এই ভাবটি একেবারেই নেই। কাজের শেষে পরিবারের সকলে মিলে হয়তো অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে বসে আনন্দ-উচ্ছাস করবে এটাই তাদের ধারা। আপন লোকেরা মিলে

নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করবে সেটাকেই লেখক উত্তম মনে করেন। এতে মনের খোরাক মেলে। তাই লেখকের পরামর্শ, আমাদের দেশেও এই স্বাস্থকর স্বাধীনতা দেওয়া হোক, সকল বন্ধন ছিন্ন করে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক স্থাপিত হোক। বিদেশের সমাজ দেখে লেখক নিজ দেশের সমাজকে এরূপ বার্তা দিতে চেয়েছেন। যেখানে তাঁর মস্ত সুবিধা বিলেতি সমাজের বাইরে থেকে সমাজটাকে তিনি আগাগোড়া দেখতে পাচ্ছেন, বিলেতি সমাজের ভিতরে থাকলে এই সুযোগ হয়তো তিনি পেতেন না।

লেখকের এই চিঠিগুলির সমালোচনা করে 'ভারতী'র সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের মতগুলি অগ্রাহ্য করে এই দেশের ও ওদেশের মানুষ সম্বন্ধে সঠিক মত পরিবেশন করেন। যেগুলি লেখক পরবর্তী কালে সঠিক বলেই মান্যতা দেন। সেই মতগুলি চিঠির পরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পর্যায় গ্রন্থ : ৩
'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'

একক-১২

দশম পত্র, একাদশ পত্র, দ্বাদশ পত্র, ত্রয়োদশ পত্র

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৩.১২.১ : দশম পত্র

৪০৪.৩.১২.২ : একাদশ পত্র

৪০৪.৩.১২.৩ : দ্বাদশ পত্র

৪০৪.৩.১২.৪ : ত্রয়োদশ পত্র

৪০৪.৩.১২.১ : দশম পত্র

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' এর দশম অধ্যায়ে লেখক স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করেছেন। এই অংশে সম্পাদক অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কিছু মতনৈক্য দেখা গেছে। তবুও লেখক বিদেশিদের স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে নিজের মত সম্পর্কে অটল থেকেছেন। লেখক সম্পর্কে সম্পাদকের অভিযোগ, স্ত্রী স্বাধীনতার নামে তিনি বেহায়াপনা, স্বেচ্ছাচারিতার কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু বিলেত অনভিজ্ঞ কোনো মানুষ এগুলিকেই অর্থাৎ বিলিতি চালকেই স্ত্রী স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা বলে মনে করতে পারেন এটিই সম্পাদক মহাশয়ের প্রধান আশঙ্কা। তিনি মনে করেন, মহিলাদের স্বামীরাও এই অত্যাচার তথা মাত্রাতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিতা সহজেই সহ্য করে নেন, পাছে তাদের স্ত্রীদের স্বাধীনতা এতটুকু ক্ষুন্ন হয়। সম্পাদকের বক্তব্য বিলেতের বিবিরা অবিনয়ী, অসরল, উচ্চের প্রতি তাদের কোনো ভক্তি নেই। লেখকের মত যদিও ভিন্ন, তিনি সেই সময় বিলেতি নারীদের তথা বিবিদের এই স্বাধীনতাগুলিকে স্ত্রী স্বাধীনতারই অঙ্গ বলে মনে করছেন। এমনকি সম্পাদক মশায়ের ইংল্যান্ডের নারীদের সম্পর্কে এই মতামতকে লেখক মিথ্যে দোষারোপ বলে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই অংশে আবার মৃদু ব্যঙ্গ করছেন ভারতীয় মহিলাদের—

> "কোন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ অভিধানে যদি বিনয় অর্থে যথাসাধ্য কথার উত্তর না দিয়ে, ঘোমটা টেনে, সংকোচে নিতান্ত ম্রিয়মান হয়ে বসে থাকা না হয় তাহলে ইংরেজ ভদ্রমহিলারা বিনয়ের আদর্শ।"

সেই সময় হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শ বা চিন্তাভাবনায় এটাই আদর্শ মহিলাদের বৈশিষ্ট্য। তবে পরবর্তীকালে যে এভাবনার জন্য প্রাবন্ধিক দুঃখিত হবেন তা নিশ্চিত। এরপর আবার উদাহরণ সহযোগে বিদেশের ভক্তি প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন তিনি—

> "যেখানে Carlyle কে গাড়ি চড়ে যেতে দেখলে কত শত রাস্তার লোক টুপি খুলে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটেছিল—সেখানে কোথায় Shakespeare একটা গাছ পুঁতেছিলেন, কোথায় Addison এর একটা চৌকি আছে, সে সমস্ত লোকে একেবারে তীর্থস্থান করে তুলেছে...সেখেনে উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা নেই কী করে বলবো?"

সেখানকার মহিলারা নির্বিচারে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন, স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে অতিথি আপ্যায়ন করেন, অতএব এই বিদেশি নারীরা স্বাধীন, লেখকের এই মত। তবে সম্পাদকের মন্তব্য পৃথিবীর বেশকিছু স্থানেই নারী স্বাধীনতা বিষয়টি রয়েছে, তবে তা নিয়ে আন্দোলন করা লেখকের উদ্দেশ্য কখোনোই হতে পারেনা। তবে লেখক যখন ইংল্যান্ডের স্ত্রী স্বাধীনতার কথা বললেন, তখনতো তাঁর বলা উচিত যে ইংল্যান্ডে নারীরা স্বাধীন নন, তারা আসলে স্বেচ্ছাচারী। আর লেখক বলেছেন, এইসব বিবিদের অনুসরণ করলে আমাদের দেশের রমনীরাও স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন। কিন্তু সম্পাদক মশায়ের এই কথা আবার লেখক মেনে নিতে পারছেন না। আসলে সতেরো বছর বয়সী নব্য যুবকের সঙ্গে এই দশম পত্রটিতে বিভিন্ন মত নিয়ে বচসার সৃষ্টি হয়েছে। তাই শেষমেশ বিবাদ মেটাতে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করলেন যে ইংরেজ বিবিদের বিবিয়ানাকেই স্ত্রী স্বাধীনতা বলে না।

সম্পাদক মহাশয় 'নির্বিষ স্ত্রীস্বাধীনতা'র কথা বলেছেন। কিন্তু এই 'নির্বিষ স্ত্রীস্বাধীনতা' আসলে কী সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বললেন, সম্পাদক মশায় হয়তো নারী-পুরুষের আলাপেরও বিশেষ বিরোধী এবং তিনি হয়তো নারীদের অন্তঃপুরে রাখতেই বেশী পছন্দ করেন। অর্থাৎ সম্পাদক মশায়ের কাছে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের যে স্বাধীনতা আছে তাই হলো 'নির্বিষ স্ত্রীস্বাধীনতা'। লেখক এই চিঠিতে পদে পদে 'ভারতী'র সম্পাদককে আক্রমণ করেছেন এবং বিলেতের স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন, সম্পাদক মহাশয় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পছন্দ করেন না। এমনকী পরপুরুষের সঙ্গে মাত্রা রেখে স্ত্রীকে মিশতে হবে যাতে স্বামীর মনে আঘাত না লাগে। বিলেতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকি এমনটা হয় যে, স্বামী মনে আঘাত পাবে বলে স্ত্রী হয়তো মন খুলে কারও সঙ্গে মিশতে পারেনা, সেইসব রমনীরা আসলে সর্বদা স্বামীর মন যুগিয়ে চলতে চায়। সম্পাদক মহাশয় বলেন, মাত্রা রাখতে জানে স্বামীরা, স্ত্রীরা তা জানে না। লেখকের মতে যদি এমন হয়েও থাকে তবে তাতে স্ত্রীরা বেশী কষ্ট পাবে কিন্তু এর জন্যে বিবাহ প্রথা তো আর বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। সুতরাং পরপুরুষের সঙ্গে এমন ভাবে মেশা উচিত নয় যেখানে স্বামীর মনে কুভাবের জন্ম হয়। আমাদের দেশে সাধারণত মাথায় ঘোমটা না টানলে লোকে কুকথা বলে কিন্তু ফিনফিনে শাড়ী পরে ঘোমটা টানলে তাতে দোষ নেই, এমনি আমাদের লোকাচার। লেখকের উপদেশ এসব বিষয় গ্রাহ্য না করে নিজের মতো করে জীবনে এগিয়ে চলতে হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে খোলা হাওয়ায় বেড়াতে গেলে লোকে কুকথা বললেও তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু যখন স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়ে অন্যত্র বাস করছে তখন লোকে খারাপ কথা বললেও তা সমীচীন। মানুষ দিন দিন যেভাবে খোশামোদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চলেছে তাতে লেখকের ধারণা তাতে স্বামী হয়তো স্ত্রীকে শ্বেতাঙ্গদের কাছে নিয়ে যাবে স্বার্থের জন্য কিন্তু নিজের কৃষ্ণকায় বন্ধুর সামনে আনবে না। সবশেষে লেখকের পরামর্শ, আমাদের দেশেও স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে খোলামেলা ভাবে মেলামেশা করুক, বিভিন্ন নিমন্ত্রণ সভায় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকুন, নানা আলোচনায় তারা যোগ দিন। এভাবে সঙ্কোচপূর্ণ মন প্রসারিত হোক। সংকীর্ণ

স্থান থেকে তাদের মন বিকশিত হোক খোলা হাওয়ায়। তারা স্বাধীন মুক্তবায়ু সেবনে স্বাস্থ্য উপভোগ করুন। এইভাবে ইংল্যান্ডের স্ত্রী স্বাধীনতা দেখে তরুণ লেখক এদেশের স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন।

৪০৪.৩.১২.২ : একাদশ পত্র

এই পত্রের আলোচনা শুরু হয়েছে লন্ডন পরিত্যাগের পর। যেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, বসন্তের আরম্ভ এবং গরমকালের কিছুটা সময় লন্ডনের মানুষের মধ্যে উৎসব মুখর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এসময়ে তারা নাচে, গানে, থিয়েটারে, আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকে। লন্ডনবাসীরা সমগ্র রাত্রি ঘরের মধ্যে বা বিভিন্ন পার্টি অনুষ্ঠানে শ্যাম্পেন আর সুন্দরী বান্ধবীদের সহযোগে মত্ত হয়ে থাকে। এরই সাথে এখানকার পার্লামেন্টে রাজনৈতিক আক্ষ্ম লোচনা বিষয়ক কথাও আমরা জানতে পারি। কারণ কনজারভেটিভ ও লিবারেল উভয় দলের মধ্যেকার রাজনৈতিক তরজা নিয়ে যে আলোচনা তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। এর সাথে লন্ডনে যখন সীজন (মরশুম) থাকে না এবং গ্রীষ্মের অবসান ঘটে, তখন সেখানকার মানুষদের ঘরে না থাকাটা ফ্যাশন। কারণ সীজন ফুরিয়ে গেলে বাড়িতে থাকাটা লন্ডনের মানুষের কাছে লজ্জাকর। তাই সীজন শেষ হবার কারণে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যরা Tunbridge Wells নামে একটি পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে যান। এখানে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনের বাতাসের আলোচনা করেছেন। যা থেকে জানতে পারি, চিমনি থেকে ধোঁয়া ও গুঁড়ো গুঁড়ো কয়লা উড়ে লন্ডনের বাতাসে মিশছে, যার ফলে বাতাস বিষাক্ত হচ্ছিল। বিষবাষ্প বাতাসে ছড়িয়ে মস্তিষ্কের ভিতরে মাথা ভার করে তুলছে। লেখক লিখেছেন—

> "দু'দণ্ড লন্ডনের রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালীর কাজ করা যায়, কয়লার গুঁড়োয় বাতাস এমন ভরপুর।"

Tunbridge Wells যে জন্য বিখ্যাত ছিল তাহল সেখানকার জলের উৎস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে এসে হতাশ হলেন, গিয়ে দেখলেন হাটের মাঝে গাউন জুতাপরা এক বুড়ি এক এক পেনি নিয়ে কাচের গ্লাসে জল বিতরণ করছে এবং মাঝে মাঝে সংবাদপত্র পড়ছে। তবে এই জায়গাটি অনেকটা ভালো এবং এখানে মানুষের মধ্যে লন্ডনের মতো ব্যস্ততা নেই। যেখানে বিভিন্ন মাংসের দোকান, কাপড়ের দোকান এবং আসবাবপত্রের দোকান রয়েছে। মাঝে মাঝে রমণীরা এখানে হাটে বাজারে বাজার করতে আসছেন। বাড়িঘরগুলি বেশ খোলামেলা পরিবেশ। সর্বত্র প্রকৃতির ছোঁয়া রয়েছে। এখানে একটি প্রিয় পাড়াগাঁর জায়গা ছিল যেখানে কবি বেড়াতে যেতেন। যার প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছপালা, পাহাড়ের ঘেরা পথ-প্রান্তর রবীন্দ্রনাথের মনকে আকৃষ্ট করেছিল।

৪০৪.৩.১২.৩ : দ্বাদশ পত্র

এইখানে রবীন্দ্রনাথ Devonshire এর টর্কি নগরে রয়েছেন। যেখান গরমকালের বর্ণনার কথা পাই। বসন্তের যে অনুভূতি এখানে উপলব্ধি করেছেন, তা ভারতে বসন্তের ভাবের সাথে মেলেনি। এই টর্কি নগরের সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথকে মোহিত করেছিল। অতি পরিষ্কার দিন, কুয়াশা নেই, অন্ধকার নেই, চারিদিকে হাস্য মুখর পরিবেশ, সবুজ গাছপালা, পাখি, ফুল ও ফল রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। এই জায়গার পরিবেশ এত আলস্য যে রবীন্দ্রনাথ এখানে দিনের বেশিরভাগ সময়ই নিদ্রাযাপন করতেন। তাই বই পড়বার বা লেখবার মতো উপযুক্ত এই টর্কি শহর নয়। এই টর্কি শহরে মিস এইচ ও মিস এন-এর সাথে ছিলেন। মিস এইচ খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন। মিস

এন কবিতা ও নভেল পড়েন এবং সনেটও লেখেন। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাদের সাথে বেড়াতে যেতেন। এই বেড়াতে গিয়ে যখনই কোন বন, জঙ্গল ও পাহাড় দেখতেন সেই সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেন মিস এইচ, মিস এন। এই ঘুরতে গিয়ে প্রকৃতির সুন্দর রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ উক্ত নারীদ্বয়কে অবাক করাতে গিয়ে কিভাবে লজ্জিত হয়েছিলেন তার কথাও এখানে আলোচিত রয়েছে। যেহেতু মিস কবিতা লিখতেন সেহেতু রবীন্দ্রনাথের কবিতা সাথে নিয়ে তাদের আলোচনা হত। রবীন্দ্রনাথ একদিন তাকে কবিতা লেখার কথা বললে মিস এন রোজ রবীন্দ্রনাথকে কবিতা অনুবাদ করে শোনাতে বলেতেন।

৪০৪.৩.১২.৪ : ত্রয়োদশ পত্র

এই অধ্যায়ের শুরুতেই নতুন বছরের (১৮৮০) প্রথম দিনের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। যেখানে দেখতে পাই যে ফ্রান্সে যেভাবে নতুন বছর নিয়ে উন্মাদনা দেখা যায়, ইংল্যান্ডবাসীর নতুন বছরকে নিয়ে তেমন উন্মাদনা নেই। তবে প্রত্যেকেই বাড়িতে বছরের শেষরাত্রিতে বাড়ির জানালা খুলে রেখেছে। কারণ বছরের শেষটি বিদায় হচ্ছে এবং নতুন বছরের শুভ সূচনা ঘটছে বলে। তবে কবিদের বাড়ির জানালা খোলা না থাকার জন্য তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রয়ে গেছেন। তবে নতুন বছরের শুরুটা ভারী মেঘ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় খুব একটা সুন্দরভাবে কাটাতে পারেনি। টর্কিতে প্রকৃতির সাথে বসন্তের যে ফুলশয্যা দেখেছিলেন লন্ডনে কিন্তু এসে তা দেখেননি। এখানে রবীন্দ্রনাথ মিস্টার কে-এর পরিবারের সঙ্গে বাস করেছিলেন। যেখানে রয়েছেন মিসেস কে, তাদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী ও টবি নামে একটি কুকুর। মিস্টার কে একজন ডাক্তার। তার বলিষ্ঠ, সুশ্রী ও অমায়িক ব্যবহার। এই পরিবারের প্রায় সকলেই ভালো। অল্প দিনের মধ্যে কবির সাথে সকলের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিশেষত মিসেস কে, রবিকে আন্তরিকভাবে যত্ন করতেন। শীতের সময় কবি গরম কাপড় না পড়লে, খাবার টেবিলে কম খাবার খেলে এবং একটু কাশি হলেই ওষুধ খাওয়া নিয়ে শাসনও করতেন মিসেস কে। এখানে মিস্টার কে-এর পরিবারের সাথে ছোটখাটো সুখ-দুঃখের কথা, আনন্দময় মুহূর্তগুলির বর্ণনা রয়েছে। এখানে বিকেলে ঘুরতে যাওয়া, সন্ধ্যা ৭টার সময় ডিনার খেয়ে ঘরে আগুন পোহানোর কথা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজি গান শিখেছিলেন, তা এখানে গাওয়ায় বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিলেন। তিনি এই পরিবারের Ethel বলে ছোট্ট ছেলেটি তাকে 'Uncle Arthur' বলে ডাকতো। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সাথে মিস্টার কে-র পরিবারটির বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তাইতো কবি লিখেছেন-

> "যা হোক, এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। সন্ধে বেলা বেশ আমোদে কেটে যায়। গান, বাজনা, বই পড়া। সকলের সঙ্গে ভারী বন্ধুত্ব হয়েছে। আর Ethel তার Uncle Arthur কে মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না।"

এভাবেই 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-য় রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে বসবাসকালে সেখানকার সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতির কথাকে তুলে ধরেছেন। যার মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের মানুষের জীবনযাত্রা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পারিবারিক সামাজিক জীবনাচরণের বৃত্তান্ত আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' সুয়েজে নৌকা অভিযানের সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। সুয়েজ পার হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছান কবি। শহরটি তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাছে কোন্ কোন্ কারণে আকর্ষণীয় হয়েছিল তার বর্ণনা দাও।

২। ইংল্যান্ডে সকলের চেয়ে আগে কোন্ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল? লেখকের দৃষ্টিকোণে ইংল্যান্ডের যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে সংক্ষেপে তার বিবরণ দাও।

৩। তরুণ লেখক লিখেছেন, "কোনো নূতন দেশে আসবার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, তা দেখে আর মহান বলে মনে হয় না।"— য়ুরোপ প্রথম দর্শনে কবির চোখে কতখানি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল তা তোমার নিজের বর্ণনায় প্রকাশ করো।

৪। প্যারিসে পৌঁছে কোন্ কোন্ বিশেষ অভিজ্ঞতা কবির চিত্তকে বিশেষ আলোড়িত করেছিল?

৫। ইংল্যান্ডের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে কেমন প্রত্যাশা জেগেছিল এবং তার ফলশ্রুতি কী হয়েছিল?

৬। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে বিলেতের মেয়েদের যাপিত জীবনের যে যে প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় তার বর্ণনা করো।

৭। য়ুরোপের জীবনযাপন অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় দাও।

৮। ইঙ্গবঙ্গদের যে তিনরকম প্রকার লেখকের চোখে পড়েছিল তার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৯। ব্রাইটনের বাড়ির গৃহসজ্জা এই রচনায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে তার শিল্পজ্ঞান ও সৌন্দর্যজ্ঞান সুপরিস্ফুট করো।

১০। আমোদপ্রমোদ, মেলামেশা, পরপুরুষ এই শব্দগুলির তাৎপর্য এদেশে এবং বিদেশে আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কীভাবে তির্যক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা হয়েছে, তা আলোচনা করো।

পত্র : ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-১৩

'রাশিয়ার চিঠি'

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৪.১৩.১ : মুখবন্ধ

৪০৪.৪.১৩.২ : রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের পূর্বে রাশিয়ার অবস্থান

৪০৪.৪.১৩.৩ : কথাশেষ

৪০৪.৪.১৩.৪ : গ্রন্থপঞ্জি

৪০৪.৪.১৩.৫ : নমুনা প্রশ্ন

৪০৪.৪.১৩.১ : মুখবন্ধ

'আপাতত রাশিয়ায় এসেছিনা এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।'

কবির বয়স তখন সত্তর। তিনি নানা দেশে ঘুরে এবার পৌঁছলেন রাশিয়ায়। তাঁর মনের ভাব পত্রের মাধ্যমে যেভাবে ব্যক্ত করেন অন্য কোনো মাধ্যমে তা করেন না। এই সূত্রে দিনলিপি, আত্মজীবনী, প্রবন্ধ ও অনেক প্রকৌশলের কথা আমাদের জানা। তবে হৃদয়ানুভূতির মধুরতম প্রকাশের স্থান হল চিঠিপত্র। এই ধরনের আত্মগত রচনাপাঠের গুরুত্ব হল সেই সূত্রে একজন মানুষকে কিছুটা পরিপূর্ণরূপে চেনার সুযোগ তৈরি হয়। সাল ১৯৩০ এবার কবির যাত্রা ইউরোপের উদ্দেশ্যে। মার্সেলিস, চেকোশ্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা নানা স্থানে কবির প্রদর্শনী ঘিরে প্রশংসার জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। দেশের খবর নিতে গিয়ে জানতে পারলেন গান্ধী গ্রেফতার হওয়ার কথা। সেই ব্রিটিশ সরকার ও নীতির সমালোচনা করেন তিনি। লণ্ডনে থাকাকালীন সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ আসে রাশিয়া ভ্রমণের। বিপ্লবোত্তর শিশু রাশিয়ার কর্মকাণ্ড দেখবার জন্যে ঔৎসুক্য ছিল দীর্ঘদিনের। 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে চোদ্দটি পত্র ও পরিশিষ্ট অংশটিতে তিনটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এই পত্রগুলি তিনি রাশিয়া ভ্রমণকালে আটজন বিশিষ্টব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলেন। রাশিয়ার কর্মকাণ্ড দেখে অভিভূত কবি তাই বলেছিলেন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থদর্শন হল রাশিয়া ভ্রমণে।

এই রাশিয়ার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় উনিশ শতকে রুশ সাম্রাজ্য গঠিত হয় ইউরোপ মহাদেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা ও এশিয়া মহাদেশের এক বিশাল অংশ নিয়ে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস থাকলেও মূলত দুই ধরনের শ্রেণি দেখা যেত—এক, অভিজাত; দুই, ভূমিদাস। এই অভিজাত শ্রেণির হাতেই ছিল সমস্ত ক্ষমতা ও শাসনদণ্ড। বহুমুখী বিধিনিষেধের মধ্যেই জীবনযাপন করতে হোত ভূমিদাসদের। এই রাশিয়ার শাসন চলছিল তখন সম্রাট জার-এর। জারের স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচার মনোভাব ও আচরণ রাশিয়ার মানুষকে অবদমিত করে রেখেছিল। ভূমিদাসদের কেন্দ্র করে প্রথম আলেকজাণ্ডারের থেকে পরবর্তী নানান শাসনকালে নানান রাজনীতি করা হয়েছে যা ইতিহাসসিদ্ধ ও সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তার প্রচার ছিল। তাদের পররাষ্ট্রনীতি শিক্ষাভাবনা সমাজভাবনা মানুষের সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে ভিন্ন ধারণা বহন করে। রাশিয়া দীর্ঘদিন থেকে চাইছিল এই অস্থিরতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে। তাদের সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতার চিত্র সকলেই জেনেছিলেন কিন্তু ভালো দিকটি ও সুবন্দোবস্তের দিকটি এমন একজনকে দিয়ে প্রচার করতে চেয়েছিলো যাঁকে বিশ্বের মানুষ ভরসা করে নির্ভর করে ও যাঁর কথাকে মান্যতা দেয় সকলে। এইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়াভ্রমণ।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে ভারতের শতাব্দীপ্রাচীন দৈন্যদশার সঙ্গে কয়েকদশক পূর্ব পর্যন্ত যে মিল ছিল ১৯৩০ সালে তার চিত্র বদলে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ভ্রমণের জন্যে আমন্ত্রণ পান। ইতিপূর্বে তিনি পাঁচবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন রাশিয়া থেকে যথাক্রমে ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৭, ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে। শেষে ১৯৩০ সালে তিনি পৌঁছান রাশিয়ায়। এবার পেত্রভ কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সফল হন। রবীন্দ্রনাথ মনে মনে দীর্ঘদিন থেকে কৌতূহলী ছিলেন এই রাশিয়া সম্পর্কে। এবার তিনি জার্মানি থেকে অবশেষে রাশিয়া পৌঁছলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ভোক্স সভাপতি পেত্রভ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,'আমি রাশিয়ায় এসেছি শিখতে; আপনাদের লোকশিক্ষা ব্যবস্থা, জনসাধারণের জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়ার কাজ, ব্যক্তিত্বের মুক্তিসাধন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে...।' সঙ্গী হিসেবে ছিলেন আমেরিকান চিকিৎসক বন্ধু হ্যারি টিম্বার্স, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কন্যা কুমারী মার্গারেট আইনস্টাইন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তামিলভাষী আশ্রমবন্ধু সচিব আরিয়ামস্ উইলিয়ামস্ ও অমিয় চক্রবর্তী।

আমাদের মনে রাখতে হবে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর কবি রাশিয়ায় ছিলেন। পত্রধারার তিন নং পত্রটি সেই ২৫ সেপ্টেম্বর লেখা। তাহলে বলা যায় প্রাপ্ত ও উল্লিখিত পত্রের মধ্যে ১ নং থেকে ৩ নং চিঠি মস্কো থেকে আর বাকিগুলি বার্লিন, ব্রেমেন, ল্যান্সডাউন ও মহাসাগর থেকে লেখা। নীচে একটি তালিকা দেওয়া হল—

পত্র নং	প্রাপক	রচনার কাল	স্থানের নাম
১ নং	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০	মস্কো
২ নং	নির্মলকুমারী মহলানবিশ	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০	মস্কো
৩ নং	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০	মস্কো
৪নং	নির্মলকুমারী মহলানবিশ	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০	? (স্থানের উল্লেখ নেই)
৫নং	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ	১ অক্টোবর, ১৯৩০	বার্লিন
৬নং	আশা অধিকারী	২ অক্টোবর, ১৯৩০	বার্লিন
৭নং	সুরেন্দ্রনাথ কর	৩ অক্টোবর, ১৯৩০	ব্রেমেন স্টিমার অতলান্তিক

পত্র নং	প্রাপক	রচনার কাল	স্থানের নাম
৮নং	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৪ অক্টোবর, ১৯৩০	অতলান্তিক মহাসাগর
৯নং	নন্দলাল বসু	৫ অক্টোবর, ১৯৩০	ব্রেমেন স্টিমার
১০নং	সুরেন্দ্রনাথ কর	৭ অক্টোবর, ১৯৩০	ব্রেমেন জাহাজ
১১নং	সুরেন্দ্রনাথ কর	৮ অক্টোবর, ১৯৩০	ব্রেমেন জাহাজ
১২নং	সুরেন্দ্রনাথ কর	৮ অক্টোবর, ১৯৩০	ব্রেমেন জাহাজ
১৩নং	কালীমোহন ঘোষ	৯ অক্টোবর, ১৯৩০	নিয়ুইয়র্ক পৌঁছবার প্রাক্কালে, স্থানের উল্লেখ নেই।
১৪নং	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	২৮ অক্টোবর, ১৯৩০	ল্যান্সডাউন
উপসংহার	(রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যোগ করেন)		

৪০৪.৪.১৩.২ : রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের পূর্বে রাশিয়ার অবস্থান

রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া পৌঁছান তখন ভারতে এক উত্তাল পরিস্থিতি। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বরাজ ভারতের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য ঘোষণা করে দিয়েছে। সেই পথ দিয়ে গিয়ে ভারতের অগণিত জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দিতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার আশা ও বিশ্বাস এই সময় থেকেই তৈরি হয় পূর্ণমাত্রায়। কুড়ির দশকে যে পরিস্থিতি ছিল তিরিশের দশকের হঠাৎ করেই অনেকখানি বদলে যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাতজন সদস্যদের নিয়ে যে সাইমন কমিশন গঠন হয় ১৯২৮ সালে ৩০ অক্টোবর লালা লাজপত রায় কমিশনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আহত হন ও সেই বছরের নভেম্বরে তিনি মারা যান। রবীন্দ্রনাথও অনেকের মতো এই কমিশনের কথা 'রাশিয়ার চিঠি'-তে উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই দেশবাসীর কল্যাণকামী একজন মানুষ হিসেব রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের তুলনা করেছেন নানানভাবে। তাঁদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে সরাসরি আমাদের দেশের জনগণ শ্রমজীবী মানুষের কথা তাঁর চৈতন্যে উপস্থিত হয়েছে বারবার। সমগ্র বিশ্বের এই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যারা ১ম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা কাটিয়ে, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ধাক্কা কাটিয়ে সদ্য জেগে উঠতে তৎপর ছিল। বিপ্লব ও হিংসা পরবর্তী শিশু রাষ্ট্রটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের ফলে তাদের অর্থনীতি ও অন্যান্য নীতি সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই সমস্তকিছু জেনে কবি এই দেশে সত্যকে দেখে সত্যকে উপলব্ধি করে সত্যকে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন প্রিয় হবার জন্যে নয়; সত্যদ্রষ্টা হয়ে ওঠার জন্যে।

বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিতে পুঁজিবাদী জার শাসনের শোচনীয় পরাজয়ের পর বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে রাশিয়ার শ্রমিক অস্থিরতা ও কৃষক আসন্তোষ চূড়ান্তরূপ ধারণ করলে ১৯১৭ সালে সংঘটিত হয় অক্টোবর বিপ্লব। ১৯১৭ সালের বলশেভিক পার্টির বিপ্লবের পর এই সোভিয়েত রাশিয়ার নবঅভ্যুত্থান বিশ্ব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। জার সরকারের অসহ্য ও সীমাহীন অত্যাচারের ফলে যে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল লেলিন

সেখানে এক ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দিয়ে বিদ্রোহ সংঘটিত করেন। তিনি ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার সূচনা করেন। কিন্তু জার সরকারের প্রবর্তিত সমাজকাঠামো সুদৃঢ় থাকায় সেখান থেকে উক্ষ্ম দ্ধারের কোনো পথ ছিল না। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আবশ্যিক প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ১৯১৮ সালে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কমে আসে এবং ১৮২৪ সালে লেলিনের মৃত্যুর পর স্ত্যালিন নবগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার হাল ধরেন। বলশেভিক পার্টির মার্কসীয় নীতির অনুসরণে রাশিয়ার পরিস্থিতি অনেকটাই স্থিতিশীল স্থানে পৌঁছে যায়। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এই রাশিয়ার রূপ দর্শন করেন। তিনি নিজের চোখে যে কাঠামোটি দেখলেন এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নবতররূপ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিদ্যমান এইরূপ পরিদর্শনে কবি আপ্লুত হয়ে এই পত্রগুলি লেখেন। যুদ্ধোত্তর ও বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকে দেখে তাই তিনি বলেন 'মস্কৌ থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। ...এমন কথাও অনেকে বলেছে, আমাকে যা এরা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো। একথা মানতেই হবে, আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।' তিনি রাশিয়ায় পৌঁছে দেখলেন মানুষের প্রতি মানুষের সম্মানবোধ, অধিকার চেতনা, গণতান্ত্রিক বিশ্বাস, মৌলিক অধিকার সব মিলিয়ে একেবারে শিকড় থেকে বৈপ্লবিক চেতনার জাগরণ অভিনব কায়দায় প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সব দিক থেকে মানুষকে বিস্মিত ও মোহিত করে রেখেছে। এর মূলে যে শিক্ষা আছে তা পুথিগত বা অক্ষরজ্ঞানের শিক্ষা নয়; এই শিক্ষা প্রায়োগিক ব্যবহারিক ও বাস্তব। এই শিক্ষাবলে তারা অসাধ্যকে সাধ্যের আওতায় এনেছে। তাই শিক্ষা তাদের চালিকাশক্তির আসনে বসে সবস্তকিছুকে পরিচালিত করে চলেছে। দেশের কোন একটি জাতিকে এই শিক্ষার বল এগিয়ে নিয়ে চলে তা রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন। এখন তিনি চাক্ষুষ উপলব্ধি করলেন। বিপ্লবের পূর্ব রাশিয়ার সঙ্গে বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার নবগঠিত রাশিয়ার সুনাম করেছেন। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় জারের আমলে সেখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল আমাদের মতই। শ্রমিকদের বেতনের হার ছিল যৎসামান্য, কারখানায় বড়ো কাজ করবার মতো অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা তাদের ছিল না। বিপ্লবের পরে তাদের অধিকার দেওয়ার পর্ব শুরু হয়। প্রবল দুর্ভিক্ষের পরে ১৯২২ সালে সোভিয়েট আমলে সমস্তকিছু ঠিকঠাক কাজ শুরু করতে পেরেছে। বাষ্কিরিয়াতে যেখানে কিছুকাল আগেও নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক সেখানে বিপ্লবের পরে 'একটি নর্মাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, একটি ডাক্তারি-শিক্ষালয়, অর্থকরী বিদ্যা শেখবার জন্যে দুটি, কারখানার কাজে হাত পাকাবার জন্যে সতেরোটি...।' সুতরাং বোঝা যায় কীভাবে রাশিয়া বিপ্লবের পরবর্তীকালে নিজের উন্নতস্তরে নিজেদের নিয়ে গেছে ! সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বহুদিনের বহু বছর ধরে বন্ধ ঘড়ি মাত্র দশ বছর দম দিতেই সচল হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে সেই দম দেওয়ার কাজটি কেউ করেনি।

৪০৪.৪.১৩.৩ : শেষকথা

'আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।'—রাশিয়ার চিঠি, অষ্টম পত্র।

১৯৩০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর এই পনেরো দিনে কবি মস্কোর অদূরে একটি কৃষি খামার পরিদর্শন ছাড়া মস্কো শহরে মধ্যে বেলারুশ বাল্টিক রেল স্টেশন থেকে গাড়িতে মস্কো, এবং সেখানে 'ভক্স'এর অতিথি হিসেবে একটি গ্রাণ্ড হোটেলে অবস্থান করেছিলেন। সমস্ত যাত্রাই ছিল নিয়ন্ত্রিত আমন্ত্রিত ও নির্ধারিত এবং সরকার অনুমোদিত। এখানে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও আলাপ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন পেত্রভ, চেখবের পত্নী ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী, পিনকোভিচ প্রমুখজন। এখানে তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারে যান এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আইজেনস্টাইন এর দুটি ছবি ও তার অংশবিশেষ দেখেছিলেন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই কবি ছিলেন নিরপেক্ষ সত্যদ্রষ্টা এবং নির্ভীক। ভ্রমণকালের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিটি পত্রে রবীন্দ্রনাথের মন জুড়ে ছিল নবজাগ্রত রাশিয়ার শিক্ষা-কৃষি-শিলকলা-স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রভৃতি। এই সমস্ত কথা বলতে গিয়ে তিনি কখনও কোনো পক্ষ অবলম্বন করেননি। তাই উপরিউক্ত কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি যেন একজন বিশ্ববন্দিত কবি নয়, তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক, সংবেদনশীল লেখক, মনোযোগী ছাত্র ও একজন দার্শনিক। তাই রাশিয়ার সমকালের কোনও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন গোর্কি ও অন্যান্যদের প্রশংসা করতে দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে ফিরে আসার পর সমগ্র জগৎবাসী অপেক্ষা করে ছিলেন কবি কীভাবে তা ব্যক্ত করেন বা কবি কীভাবে তার বর্ণনা দেন ! কবি তো একটি পত্রেই বলেছিলেন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যা হয়নি সেই ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞের দর্শন করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রবাদের পরিপূর্ণ রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। তবুও তিনি রাশিয়ার কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করেছেন। তিনি সেখান থেকে ফিরেই প্রতিমা দেবীকে লিখেছিলেন 'আমি যা বহুকাল ধ্যান করেচি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে।' (চিঠিপত্র) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার যে সাধনা কবি দেখেছিলেন তার কথা তিনি সগর্বে ব্যক্ত করেছেন। রাশিয়া থেকে ফিরে যাওয়ার পরে ব্রেমেন স্টিমার থেকে সুরেন্দ্রনাথ করকে আমেরিকা পৌঁছানোর প্রাক্কালে একটি চিঠিতে বলেছিলেন (বর্তমান গ্রন্থে ৭ নং), সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে গবেষণা চলছে, কর্মকাণ্ড লেগেই আছে; কিন্তু রাশিয়ায় একটু ভিন্ন কাজ চলছে। 'এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে, সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত ক'রে এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিরূপ ধারণ করেছে। সব কিছু মিলে গেছে একটি অখন্ড সাধনার মধ্যে।' এই সাধনার স্থল দেখাটাকে তাই তিনি তীর্থস্থানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে যারা সাধারণের চিত্ত, সত্ত্ব ও সত্তা বলে কাজ করছে তারা অজ্ঞাতেই অসাধারণের যজ্ঞকর্ম করে বসেছে। সেই কারণে তিনি উক্ত পত্রে বলেছেন, 'রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল।'

একদিকে যেমন কবি বিস্মিত হয়েছেন রাশিয়ার কর্মকাণ্ড দেখে অন্যদিকে আবার তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছেন ভারতবর্ষের মতো দেশে জন্মগ্রহণের জন্যে। ৮ নং পত্রে বলেছেন, 'নিজেদের দেশের অতি দুর্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি, কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেছে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়েছি। কর্তৃপক্ষের সাহায্য চেয়েছি; তাঁরাও বাহবাও দিয়েছেন; যেটুকু ভিক্ষে দিয়েছেন তাতে জাত যায়, পেট ভরে না।' রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে ফিরে এলেও তার কথা বাকি সমস্ত জীবন তাঁর চেতনালোকে ছিল। এমনকি ১৯৪১ সালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত কবি নাৎসি আক্রান্ত রাশিয়ার প্রতি আত্মিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। দেশশাসননীতির সমালোচনা করতেও রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাবোধ করেননি। আমাদের মতো দেশ যা ইংরেজদের শাসনের অধীনে প্রায় দু'শো বছর ছিল। সেই দেশের শাসননীতির

ভাষা ছিল ইংরেজি। ভাষা ইংরেজি হওয়ায় শাসননীতির সম্পর্কে সাধারণের কোনো ধারণাই তৈরি হয়নি। এই আয়ত্তাতীত ভাষা শাসকের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কসূত্র গড়ে তুলতে পারেনি। ভাষা এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে থেকেছে যাপনের সর্বক্ষেত্রে ও সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে আমাদের করেছে বঞ্চিত। সুতরাং 'রাশিয়ার চিঠি' শুধু একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতিবাহক কয়েকটি পত্রের সমাহার নয় কবির বিশ্বাস ও আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ।

৪০৪.৪.১৩.৪ : গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রাশিয়ার চিঠি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রজীবনী (৩য় খণ্ড)

প্রশান্তকুমার পাল — রবিজীবনী

৪০৪.৪.১৩.৫ : নমুনা প্রশ্ন

ক) রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের পূর্বে রাশিয়ার রূপ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

খ) রাশিয়ার চিঠি নামক গ্রন্থে রুশ বিপ্লবের পরবর্তীকালে যে পরিবর্তনগুলি প্রভূত পরিমাণে সাধিত হয়ে তার উল্লেখ করো।

পত্র : ডিএসই-৪০৪
বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-১৪

'রাশিয়ার চিঠি'

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৪.১৪.১ : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

৪০৪.৪.১৪.২ : গ্রন্থপঞ্জি

৪০৪.৪.১৪.৩ : নমুনা প্রশ্ন

৪০৪.৪.১৪.১ : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

'রাশিয়ার চিঠি'র বিষয় ভাবনা কিছু বলার শুরুতেই কবির একটি মন্তব্য আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে। ৬ নং পত্রে কবি উল্লেখ করেছেন, 'এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে—শিক্ষা কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে।' সুতরাং এই তিন দিকের চিত্র প্রকাশেই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যায়। আমরা সকলেই জানি যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। তিনি মনে করতেন সকল প্রকার দুঃখের অবসান সম্ভব শিক্ষাবিস্তারের মধ্যে দিয়েই। কবির কাছে সেই শিক্ষা আত্মশক্তির উদ্বোধন আত্মশক্তির জাগরণ। একসময় সমগ্র য়ুরোপে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি চলতো, কিন্তু বর্তমানে তা আর নেই কারণ সেখানে শিক্ষার বিস্তার হয়েছে। আমাদের দেশে এত সমস্যার প্রধান কারণ হল শিক্ষার অভাব। মানুষের সকল সমস্যার সমাধানের মূলেই আছে শিক্ষা। তাই তিনি যখনই শুনেছিলেন রাশিয়াতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রায় শূন্য থেকে প্রভূতপরিমাণে বেড়ে গিয়েছে; তখন তিনি আর না গিয়ে থাকতে পারেননি। কবি অনুভব করেন, 'এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একমাত্র উপায় শিক্ষাঅন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই'পরে নির্ভর করে।' যুগান্তকারী পরিবর্তনের মূলেই ছিল শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে উন্নত করে চিত্তের পরিশুদ্ধি ঘটায়। তাই তিনি রাশিয়ায় গিয়ে সেখানের শিক্ষাবিধি ও ব্যবস্থাকে বিশেষকরে নজর দিয়েছিলেন। তাঁর আকর্ষণ ছিল কীভাবে কোন পদ্ধতিতে তাঁরা এই অসাধ্যসধন করছেন তার রূপ ও পরিসর একবার দেখার।

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি মৌলিক চিন্তনের কথা সর্বত্রই দেখেছি। আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলই একটি নিজস্ব মৌলিক দেশজ মডেল। সেখানে তপোবনসুলভ ও টোলব্যবস্থার সঙ্গে কিছু মিল পাওয়া যেতে পারে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে যার বিকাশ সেই ভাবনাকে প্রসারিত করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। ৩ নং পত্রে তিনি লিখেছেন—'আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয়, এজন্য আমাদের মন্দভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হূহূ করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষাকেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম. এ. পাশ করবার মতন নয়।'

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন মুলত তাঁদের শিক্ষাবিধি দেখতেই। ৬ নং পত্রে আছে, 'রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে গিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী।' তাদের অধ্যয়নকাল 'আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়' সুতরাং এরা স্বল্প সময়েই অনেক কিছু পড়তে পারে। তাদের যাপনের কথা রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত করে বলেছেন ৬ নং পত্রে। রাশিয়ায় চিত্রপ্রদর্শনীতে গিয়ে কবি উপলব্ধি করেন এখানে নির্মাণ এবং সৃষ্টির প্রতি গভীর দৃষ্টি আছে। তারা অন্তর থেকে সমস্ত কাজ করে বলেই তা নিজস্ব ও সবচেয়ে বড়ো কথা ছবি হয়ে ওঠে। শিক্ষার এমন বিরাট পরিসরে ও বৃহৎ ক্ষেত্রে বিকশিত হয়ে ওঠার নিদর্শন কবি ইতিপূর্বে সমগ্র বিশ্বের আর কোথাও দেখেননি। ৭ নং পত্রে বলেছেন,"শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই—'দুধুভাতু খায় সেই'। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা 'বিশ্বকর্মা'; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।" শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এরা সকলের কাছে বিখ্যাত হয়ে ওঠার যোগ্যতামান অর্জন করেছিল। নানান ধরনের ম্যুজিয়ম গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে শিক্ষাকে উন্মুক্ত ও সর্বসাধারণের গ্রহণ করবার যোগ্য করে তুলেছিল। শান্তিনিকেতনে যে প্রতিষ্ঠানটি লাইব্রেরির মতো 'অকারী (passive)' সেই প্রতিষ্ঠানটি রাশিয়ার কাছে হয়ে উঠেছিল 'সকারী (active)'।

একটি সমাজ যে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে তার প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ১৯১৭ সালের পূর্বে একটি গ্যালারিতে দর্শকাসনে থাকতো তা ছিল ধনী মানী জ্ঞানীদের দলবল; কিন্তু এখন আসে 'স্বশ্রমজীবীর দল' যেমন—রাজমিস্ত্রি, লোহার, মুদি, দর্জি এবং চাষী সম্প্রদায়ের মানুষজন। আর্টের বোধ যত ছড়িয়ে পড়ে আর্টের কদরও তত বৃদ্ধি পায়। ছবির মধ্যে যে একটি স্বকীয় ভাষা আছে ছন্দ আছে সেই বিষয়টি বুঝে ছবি দেখার উদ্যম সকলের কাছেই গর্বের বিষয়। এই বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের মানসিকতা যে-কোনো রাষ্ট্রের কাছে প্রধান সম্পদ বলেই কবি

মনে করেছেন। ভারতবর্ষের মতো দেশে শিক্ষা কীভাবে দেশটিকে পিছিয়ে রেখেছে সেকথা বলতে গিয়ে ৮ নং পত্রে বলছেন,'আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যতকিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।' রাশিয়ার ক্ষেত্রে একটিমাত্র শক্তি তাদের এগিয়ে দিচ্ছে তা হল 'শিক্ষা'। শিক্ষার প্রসারের কারণেই আজ তারা মহৎ ও সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃতির দিক থেকেও রাশিয়ায় নবনাট্যকলার নানান দিকে তাদের উন্নতি কবি চোখে ধরা পড়েছে। সমাজে রাষ্ট্রে রাজনীতিতে কোথাও তারা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়নি, নতুনকে সবসময় আহ্বান জানিয়ে এসেছে। বিপ্লবের সময়েও নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে আর্ট ও আর্টের সামগ্রী যেন কোনোভাবেই বিনষ্ট হতে না দেওয়া হয়। তারা ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে মূল্যবান সামগ্রীগুলি রক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যুজিয়ামে সংগ্রহ করেছিল। আর্টের প্রতি যাদের এতো ভালোবাসা ও দরদ তাদের হাত থেকে সংস্কৃতি কখনও ছিন্ন হতে পারে না। 'সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকারবর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয়নি।' পশুর পক্ষে বেঁচে থাকার জন্যে শুধু পেটের খাবার হলেই যথেষ্ট; কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকতে শুধু পেটের খাবার নয়, মনের খাবারও দরকার হয়। মনুষ্যত্বের বিকাশে এই বোধ সর্বপ্রথম তাদের জন্মেছিল। তাই আমাদের সাহিত্য যেখানে খুঁজে পাওয়া যায়না তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেখানে যত্নসহকারে রক্ষিত হয়েছে। বিপ্লবের সময় আনেক মূল্যবান জিনিস ওলট পালট হয়ে গিয়েছে—একথা সত্য কিন্তু বেশির ভাগ রক্ষা পেয়েছে। আমাদের মতো দেশে যেসব উপাদান হারিয়ে গেছে বা রক্ষা করা বা করতে দেওয়া হয়নি, সেই ঘটনা তাদের ক্ষেত্রে হয়নি। বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্ত বিষয়ে তারা বড্ড উৎসাহী এবং তার রক্ষণাবেক্ষণেও তাদের আগ্রহ ভীষণ। কারণ তার থেকে সাধারণ মানুষের শিক্ষার খোরাক যোগানো হয়। আমাদের দেশে যা ধনীরাও রক্ষা করেনি বা কিছুটা আত্মস্থ করেছে এখানে সেটা সকলে মিলে করেছে। এই গুণেই তারা সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার নামে যে কাণ্ড শুরু হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা টেনে বলেছেন ইংরেজরা শিক্ষাদানের নাম করে যে কর আদায় করছেন সেখানে তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রধানরূপে প্রতীয়য়ান। কবি বলেছেন—(৯ নং পত্রে) 'আমি নিজে চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমাজ চেষ্টা।' তা সত্ত্বেও তাদের নামে সাম্প্রদায়িক আক্ষা দিয়ে নানান কটূকথা বলতে শোনা যায়।

শিক্ষার সঙ্গে ভ্রমণের একটি প্রাসঙ্গিক যোগসূত্র আছে তা ১০ নং পত্রপাঠে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই ভ্রমণের উপর জোর দিয়ে শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে কথা বলেছেন। পড়ে শেখার থেকে চোখে দেখে শেখার গুরুত্ব কম নয়। চোখে দেখে শেখার নাম ভ্রমণ। যে-কারণে তিনি শুধু ভ্রমণের জন্যেই ঘুরে বেড়াতেন বছরের অধিকাংশ যময় ও বিশ্বের অধিকাংশ দেশে। ভারতবর্ষের রূপ অনুধাবন করতে যদি কেউ হাণ্টারের ইতিহাস পড়েন তাহলে তা নিতান্তই অমানবিক, অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। একসময় চৈতন্যদেব পদব্রজে নীলাচলে যাত্রা করেন, বিবেকানন্দ পদব্রজে ভারত তথা বিদেশে গিয়েও বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করেন। প্রাচীনকালে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্যে

এই ভ্রমণ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিল। পুথির প্রয়োজন অস্বীকার করবার নয় কিন্তু ভ্রমণের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। উল্লিখিত পত্রে কবি বলেছেন, 'সোভিয়েট রাশিয়ায় দেখছি সর্বসাধারণের জন্যে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা ফলাও করে তুলেছে। বৃহৎ এদের দেশ, বিচিত্রজাতীয় মানুষ তার অধিবাসী। জার-শাসনের সময়ে এদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ জানাশোনা মেলামেশার সুযোগ ছিল না বললেই হয়। বলা বাহুল্য, তখন দেশভ্রমণ ছিল শখের জিনিস, ধনী লোকের পক্ষেই ছিল সম্ভব। সোভিয়েট আমলে সর্বসাধারণের জন্যে তার উদ্যোগ।' বিষয়টি বিশেষভাবে প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ। দেশভ্রমণে ভা ভ্রমণ উপলক্ষে সর্বসাধারণের আনুকূল্য করার সুযোগ তৈরি হয়। রাশিয়ায় ভ্রমণ পিপাসু মানুষের আহার নিদ্রার ব্যবস্থা দেখে কবির মনে হয়েছে জনহিতকল্পে এমন কাজের মূল্য সর্বাধিক।

শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত বিধিব্যবস্থাকে কবি যে সব মেনে নিয়েছিলেন তা নয়; কিছু কিছু তাঁর অপছন্দও ছিল। যেমন তিনি মনে করেছিলেন রাশিয়ার মানুষেরা যে শিক্ষাবিধি প্রণয়ন করে একটি প্রকাণ্ড ছাঁচ বানিয়েছে সেই ছাঁচে ঢালা ব্যবস্থা কখনো চলতে পারে না। তাই তিনি 'তোতাকাহিনী'র মতো বিস্তর রচনার মধ্যে দিয়ে তীব্র কটাক্ষও করতে ছাড়েননি। তাঁর মত ছিল 'সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয়, মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ঠ হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।' (১ নং পত্র)

স্বাস্থ্য

শিক্ষার পাশাপাশি রাশিয়ার সরকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতিও নজর দিয়েছেন অভিনব উপায়ে নিরালস্য পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে রাশিয়া যে-রকম অগ্রদূতের আসন গ্রহণ করেছে য়ুরোপ আমেরিকাও তার প্রশংসা করেছে। মানুষের ন্যূনতম চাহিদা হল অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। সর্বসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের চেতনা যাতে পরিচিত করা যায় তার জন্যে রাশিয়ার শাসকশ্রেণি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়াভ্রমণের পরে রবীন্দ্রনাথের বারবার মনে হয়েছে ভারতে মুমূর্ষুদের জন্যে কতখানি কী করা হয়েছে! সেখানে মানুষ কীভাবে মারা যান তার চিন্তা কবিকে কষ্ট দিয়েছে। জন্মসূত্রে যারা রাশিয়ার মতো দেশে জন্মেছে বলেই কী এত সুযোগ সম্মান! আর জন্মসূত্রে যারা বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে তাদের কী কোনোভাবেই মনুষ্যত্বের অন্তিম সম্মানটুকুও আশা করা উচিত নয় ? সমস্যা সব দেশেই আছে বা থাকবে। তার জন্যে দায়ি কে ? 'সেই জন্যেই প্রশ্ন না করে থাকা যায় না, ডিফিকল্‌টিজটা ঠিক কোন্‌খানে?' (১০ নং পত্র) যেখানে রাশিয়ায় 'যারা খেটে খায় তারা সোভিয়েট স্বাস্থ্যনিবাসে বিনা ব্যয়ে থাকতে পারে, তাছাড়া এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শ্রুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই-সমস্ত ব্যবস্থাই সর্বসাধারণের জন্যে। এই সর্বসাধারণের মধ্যে এমন-সব জাত আছে যারা য়ুরোপীয় নয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসারে যাদের অসভ্য বলা হয়ে থাকে।'

৪০৪.৪.১৪.২ : গ্রন্থপঞ্জি

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — রবিরশ্মি
প্রমথনাথ বিশী — রবীন্দ্র বিচিত্রা

৪০৪.৪.১৪.৩ : নমুনা প্রশ্ন

ক) রাশিয়ার চিঠি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পত্রে শিক্ষার যে কথা প্রকাশিত হয়েছে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দাও।

খ) স্বাস্থ্য বিষয়ক ভাবনার কথা কীভাবে রাশিয়ার চিঠিতে ছড়িয়ে আছে তা সংক্ষেপে প্রকাশ করো।

পত্র : ডিএসই-৪০৪
বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-১৫
'রাশিয়ার চিঠি'

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৪.১৫.১ : সাধারণ মানুষ
৪০৪.৪.১৫.২ : গ্রন্থপঞ্জি
৪০৪.৪.১৫.৩ : নমুনা প্রশ্ন

৪০৪.৪.১৫.১ : সাধারণ মানুষ

সাধারণ মানুষের চিন্তা যাঁরা করেছেন তাঁদের অগ্রগতির ইতিহাস অনেক বেশি সরল হয়েছে। রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের উন্নতির দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে বিস্মিতও। মানবজীবনের এই মহান কর্মযজ্ঞে সাধারণ মানুষদের এতো মর্যদা দেওয়ার প্রবণতা স্বভাবতই কবির কাছে গভীর পরিতৃপ্তির কারণ। সভ্যতাকে তারাই এগিয়ে নিয়ে যায় অথচ তাদের হাতেই কিছু থাকে না, সবাইকে আলোর রশ্মি প্রদান করে নিজেরাই থাকে অতল অন্ধকারে সেই মানুষগুলিকে এতো সুখী দেখে কবি ভীষণ প্রশংসা না করে পারেননি। ১ম পত্রেই তিনি উল্লেখ করেছেন, 'চিরকালই মানুষের সভ্যতায় এক দল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তার পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরেজীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে, সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকেউপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।' দীর্ঘদিন তিনি তাদের কথা ভেবে ভেবে একসময় মনে করতে শুরু করেন যে, এদের কোনো পথ নেই। তিনি বুঝেছিলেন 'বাইরে থেকে উপকার

করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়।' এই কথা তিনি 'লোকহিত' প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন 'যে-মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে-মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম।'

সাধারণ মানুষের মধ্যে 'চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ' দেখে কবি বিশেষভাবে আপ্লুত ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন থিয়েটার ও অপেরার দর্শকের সংখ্যা যেখানে এই সাধারণ মানুষ সেখানে উন্নয়ন তো অবশ্যম্ভাবী। যেখানে কোনো জবরদখল নেই সেখানেই তো প্রকৃত উন্নতি। কবি সেইকারণে বলেছেন, 'আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে।' আমরা যেখানে ভারতবাসী হিসেবে আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমগ্ন সেখানে রাশিয়ার মানুষেরা নতুন করে নতুন পদ্ধতিতে জেগে ওঠার প্রেরণা দেখে কবির যে চমক লেগেছিল তা বলাই বাহুল্য। রাশিয়ার জনসাধারণ এখন ভদ্রলোকেদের ছায়ায় ঢাকা পড়েনি তারা প্রকাশ্যে এসেছে। সর্বোপরি তারা মানুষ হয়ে উঠেছে দ্রুত এই কয়েক বছরে। রাশিয়ায় জাতিবর্ণভেদ বা বর্ণবিচার না থাকায় সকলের আসন সমান হয়ে উঠেছে। সকলেই সকলের জন্য—এই বার্তা তাদের সর্বত্র ছড়ানো। বিশ্বব্যাপী ও সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীদের প্রতি সহমর্মিতাবোধ বজায় রেখে তাই তাঁকে বলতে দেখা যায়,—'মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব, আমার জীবনদেবতা আমাকে এই মন্ত্র দিয়েছেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্মাল্য ললাটে পরে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোশ পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে তখনই এরা আমাকে ভারতবর্ষীয় রূপেই শ্রদ্ধা করে; যখন নিছক ভারতবর্ষীয় রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে।' তিনি তো চিরকাল মানুষের পাশে মানুষের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছেন—এই বিষয়টি আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি দেবত্ব চাননি, মহানতা চাননি তিনি চেয়েছিলেন সাধারণের সঙ্গে সাধারণ হয়েই থাকতে। এইখানেই তাঁর মহত্ব।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নীতিনির্ধারণকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র একটি রাষ্ট্র কীভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে তা নিজে চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করা যায় না—এমন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন কবি। রাশিয়ার চাষী ও মজুরদের কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মনে হয়েছে তাদের যেন কেউ আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কাঠি স্পর্শ করে দিয়েছে। বছর কয়েক পূর্বে যারা ছিল নিঃসহায়, নিরক্ষর ও নিরন্ন নানান দুঃখের মধ্যে আর আজ তারা স্বাবলম্বী ও শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি তারা মানুষ হয়ে উঠেছে। যাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতোদিন স্বীকার করাই হয়নি তারা আজ একাসনে বসে নীতি নির্ধারণ করে। উন্নয়ন এখানেই।

৪০৪.৪.১৫.২ : গ্রন্থপঞ্জি

প্রশান্তকুমার পাল — রবিজীবনী

শৈলেন চৌধুরী (সম্পাঃ) — 'তীর্থদর্শন' এর পঞ্চাশ বছর

৪০৪.৪.১৫.৩ : নমুনা প্রশ্ন

ক) 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার চিত্র এবং সেখান থেকে উত্তরণের পথ সম্পর্কে কী কী কথা বলেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

খ) শ্রমিক শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে যে মন্তব্য ও সহানুভূতির কথা এই গ্রন্থে স্মরণীয় হয়ে আছে তার বর্ণনা দাও।

পত্র : ডিএসই-৪০৪
বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-১৬
'রাশিয়ার চিঠি'

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৪.১৬.১ : কৃষি ব্যাবস্থা ও কৃষকদের কথা

৪০৪.৪.১৬.২ : গ্রন্থপঞ্জি

৪০৪.৪.১৬.৩ : নমুনা প্রশ্ন

৪০৪.৪.১৬.১ : কৃষিব্যাবস্থা ও কৃষকদের কথা

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছিলেন,'এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে,—শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র।' জারের শাসনকালে রাশিয়া প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবেই পরিগণিত ছিল; শিল্পের জন্যে তাঁদের ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করতে হোত। বাইরের দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বলতে শুধু তেল রপ্তানিই ছিল প্রধান। সেই রাশিয়ায় জারের শাসনকাল শেষ হবার পর কিছুকাল ভয়ানক দুর্দশার রূপ নজরে আসে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে অসাধারণ স্থিরবুদ্ধি ও পরিকল্পনাকেন্দ্রিক জীবনযাপনে ক্রমাগত উন্নয়নশীল দেশে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কবি তাই ২ নং পত্রে উল্লেখ করেছেন, 'এখানে এসে যেটা সব-চেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা একমুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি।'

রাশিয়ায় জমিদারী এবং দীর্ঘদিনের প্রভাবশালীদের দ্বারা পরিচালিত মহাজনী প্রথার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বসাধারণের অধিকার। সম্পদ সম্পর্কিত একাধিক উপকরণ সেখানে মহাজনদের হাত থেকে গিয়ে পৌঁছাল সর্বসাধারণের হাতে। লেলিন চেষ্টা করলেন কৃষক ও শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে কাজ করাতে। ধনতান্ত্রিক

বিভিন্ন দেশে মজুরি দিয়ে কাজ করানোর প্রচলন থাকলেও রাশিয়ায় তার প্রবণতা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাশিয়ায় মজুরেরা পেল নিজেদের গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ। কৃষি খামার, বীজ, কৃষিকাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও ফসল ফলানোর প্রক্রিয়া এবং মজুত করে রাখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাদের ভাগ্য খুলে দিয়েছিল। একটি রাষ্ট্র তাদের মঙ্গলের জন্যে যে অর্থ ও সময় ব্যয় করেছে তা পরিপূর্ণভাবে তাদের মঙ্গলের জন্যেই ব্যয়িত। সেই কারণে তাদের জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দের প্রাচুর্য সুলভে দেখতে পাওয়া যেতে শুরু করে। ৩ নং পত্রে কবি বলেন,'এরা তাকেওসনাতনী ব্যবস্থাগ্ন একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে।' হাজার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াসকে কবি বিস্ময়কর ঘটনা বলেই উল্লেখ করেছেন। যাদের হাতে ধন ছিল ক্ষমতা ছিল তাদের সঙ্গে আজ সর্বহারাদের অসাম্য দূর করবার যে প্রচেষ্টা তা কবিকে অভুভূত করে তুলেছিল।

মস্কৌতে একটি কৃষিভবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছিলেন, 'এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোটোবড়ো শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এ-সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকলপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের ম্যুজিয়ম, তা ছাড়া চাষীদের সকলপ্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।' রাশিয়ার গ্রামের চাষীরা যখন গ্রাম থেকে শহরে আসে তখন তাদের খুব কম খরচে এই ধরনের বাড়িতে থাকার সুযোগ পায়। সুতরাং নিরক্ষর চাষীদের চিত্তের উদ্বোধনে এই কর্মযজ্ঞ কবিকে অভিভূত করেছিল। বিগত দশ বছরে রাশিয়ার চাষীরা ভারতের চাষীদের থেকে কতদূর এগিয়ে গিয়েছে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কবি বলেছেন(৫ম পত্রে), এখানের চাষীরা 'কেবল বই পড়তে শেখেনি; ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে। শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হয় না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষের মতো এ দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্যে কৃষিবিদ্যাকে যত দূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে কথা ভোলেনি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।' রাশিয়ায় কৃষি-কলেজগুলি তাদের উপযুক্ত কাজ করে চলেছে নিরন্তর। বীজ শুধু তৈরি করাই নয়, তাকে অতিদ্রুত সকলের হাতের নাগালে নিয়ে আসাই তাদের দায়িত্ব বলে মনে করে। এই ধরনের ব্যবস্থা যেখানে প্রচলিত সেখানে মানুষ চাষ করে আনন্দ পাবে, সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে—এটাই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন প্রয়োজন সেকথা কবি নিজে উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীনিকেতনে কাজ করতে গিয়ে। আমাদের দেশের কৃষক একদিকে 'মূঢ় আর-একদিকে অক্ষম, শিক্ষা এবং শক্তি দুই দিক থেকেই বঞ্চিত।'এরা প্রথাকে এতো মেনে চলে তার তুলনায় পরিশ্রম করে কম। ফলে ফসল ফলে কম 'কর্তৃত্ব' ফলে বেশি মাত্রায়।

সকলে মিলে কাজ করার চিন্তা ভাবনা থেকেই এই সমবায়নীতির কথা উঠে আসে। তারা নিজেরা নিজেদের পরিচালনা করে, সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে এবং যেটা সকলেরই পক্ষে শ্রেয় সেটাকেই গ্রহণ করে—এই নীতি দেখে কবি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

৪০৪.৪.১৬.২ : গ্রন্থপঞ্জি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় — রাশিয়ার কথা

ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় — রুশিয়ার রূপান্তর

অরুণকুমার বসু — রাশিয়ার চিঠি ও রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-ভাবনা

৪০৪.৪.১৬.৩ : নমুনা প্রশ্ন

ক) রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাদের কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ও কৃষকদের প্রচেষ্টা বিষয়ক যে কথাগুলি জানিয়েছেন তা বর্ণনা করো।

খ) হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও কীভাবে এই কৃষকশ্রেণি সরকারের প্রচেষ্টায় উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ দাও।